সুখ দাও ভগবান

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য সংস্থা
১৪/এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রনধীর পাল
১৪এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
২৩ জানুআরি ১৯৬০

প্রচ্ছদ শিল্পী
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রাকর
কমল মিত্র
নব মুদ্রণ
১বি, রাজা লেন

লেখকের অন্যান্য বই

অনলপ্রভ বিদ্যাসাগর
গুদোমে গুমখুন
প্রভু জগন্নাথ
ঝড
দিদি
খেযাল
নিযতি
বেশ আছি বসে বশে
যা হয, তাই হয
মামা এক মামা দুই মামা তিন চাব
আরোহী
কালের কাণ্ডারী
গিরিশচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীরামকৃষ্ণের গিরিশচন্দ্র
শ্রীচরণকমলে
মুখোমুখি শ্রীবামকৃষ্ণ
দাদুর কীর্তি
গাঙচিল
কিচির মিচির
সাপে আর নেউলে
রাত বারোটা
কাটলেট
কিশোর বচনাসম্ভার ১ম, ২য়, ৩য়
হেডস্যারের কাণ্ড
বড়মামার কীর্তি
থ্রি-এক্স
বাঘমারি
সপ্তকাণ্ড
সাত টাকা বারো আনা
হাসি কান্না চুনী পান্না
পুরনো সেই দিনের কথা
গাধা
সুখ ১ম, ২য়, ৩য়
আন্দামান : ভারতের শেষ ভূখণ্ড
বাঙালিবাবু
উৎপাতের ধন চিৎপাতে
হাসির আড়ালে
নির্বাচিত রম্যবচনা সমগ্র ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ
১৩টি উপন্যাস (একত্রে)

আনন্দের তারে ঈশ্বরের বিদ্যুৎপ্রবাহে
বাল্বের মতো জ্বলে থাকো

কী চাই?

শান্তি আর আনন্দ! সুখ চাই। বেশ সুখে, শান্তিতে, আনন্দে বাঁচতে চাই। যাঁরা সাধক, যাঁরা ভগবানের মহল্লায় ঘোরাফেরা করেন, তাঁরা বলবেন, "আনন্দ? তুমি তো নিজেই আনন্দস্বরূপ। ভগবান এক বিরাট আনন্দ, মানুষ সেই আনন্দেরই টুকরো। মানুষের স্বভাবই আনন্দ। নতুন করে তুমি কোন আনন্দ তৈরি করবে, তুমি শুধু বেঁচে থাকো। তুমি আনন্দের তারে ঈশ্বরের বিদ্যুৎপ্রবাহে বাল্বের মতো জ্বলে থাকো। ফিউজ হয়ে যেও না।"

কিন্তু সারা পৃথিবীটা যে একটা জঘন্য জায়গা! বেঁচে থাকাটা একটা মহা 'পানিশমেন্ট'। টাকা, পয়সা, বিষয়, সম্পত্তি, হ্যানা-ত্যানা সুখও দিতে পারে না। শান্তিও দিতে পারে না। সর্বত্রই ভূত-প্রেতের নৃত্য। কামড়া-কামড়ি, আঁচড়া-আঁচড়ি। সুখে সুখী—এ তো সহজ কথা। সুখ তো ভোরের শিশির। চড়া রোদে আর নেই। জীবন যেন দুঃখের পরটা। পরোতে পরতে গ্যাদগ্যাদে অশান্তি, উৎকণ্ঠা। সেই টেকনিক রপ্ত করতে হবে দুঃখে সুখী। আমার ভিতরে সুখ। দুঃখ আমার করবেটা কী? ইংরেজিতে দু'টি শব্দ আছে—'হ্যাপিনেস' আর 'ব্লিস'। সুখ আর প্রশান্তি। সুখ

আছে 'বাইরে, প্রশান্তি আছে ভিতরে।

এসব অনেক দিনের অনেক পুরনো কথা। অর্থাৎ 'মা'-এর দরজা দিয়ে ট্যাঁ-ভ্যাঁ করে পৃথিবীতে প্রবেশ করেই মানুষ দেখলে, এক গাদা বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি মানুষ আসর সাজিয়ে বসে আছে। মুগুর ঘুরিয়ে, মুলোর মতো গজাল-গজাল দাঁত বের করে শাসন করছে ফেমাস-ফেমাস সব রাক্ষস আর অসুর। বকাসুর, অঘাসুর, বৃত্রাসুর, মহিষাসুর। 'হিরোইন'—পুতনা। মিস পুতনা, মিস হিড়িম্বা, মিস শূর্পনখা।

সেই যুগের সেন্সাস রিপোর্টে পাচ্ছি কয়েকটি বিভাগ—অসুর, দৈত্য, দানব। এঁরা হলেন ঋষি, মুনিদের পদস্খলন বংশধর। ধুনি জ্বালিয়ে জপ, ধ্যান করতে করতে মশার কামড়ে অস্থির আর উত্যক্ত হয়ে, ধ্যাত্ তেরিকা বলে এমন সব কাণ্ড করলেন দমাদ্দম এসে গেল 'সিরিজ অব রাকসস'। দাঁত আর মুখের গঠন অনুসারে গোত্র বিভাজন—অসুর, আসুরী, দানব, দানবী, দৈত্য। মানুষ কাঁদতে কাঁদতে জন্মায়, অসুররা হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে জন্মায়। দানবীয় হাসি। এরা সবসময় 'ইন টার্মস অফ মৃত্যু' কথা বলে। 'শোলের' গব্বর। ঋষিকন্যা, দেবকন্যাদের ধরে এনে ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে নাচ দেখে। এদের গুরু হলেন 'শুক্রাচার্য'।

কম্পিউটারের যেমন, 'ফার্স্ট জেনারেশন', 'সেকেন্ড জেনারেশন' ইত্যাদি আছে সেইরকম অসুরদেরও 'ফার্স্ট জেনারেশন', 'প্রেজেন্ট জেনারেশন' আছে। দেবতারা সব 'স্ট্যাটিক'। তাঁদের কোনও 'ডেভালপমেন্ট' নেই, অগ্রগতি নেই, পরিবর্তন নেই। চার মাথা ব্রহ্মা, পাঁচ মাথা মহাদেব, চার হাত বিশিষ্ট নারায়ণ। ইন্দ্র, কুবের, কার্তিক, এঁদের কোনও ক্যালেন্ডার চিত্র নেই। মুম্বইয়ের ক্রিকেটার শচীন আর গণেশ সমান পপুলার। মহাদেবের মার্কেট ভীষণ ভাল 'নারকোটিকস'-এর কৃপায়। শ্রীকৃষ্ণ 'টপ'-এ আছেন। শ্রীমতী রাধিকা তাঁকে ফেভার করেছেন। কিন্তু এঁরা সব ছবি হয়েই রয়ে গেলেন মানুষ হতে পারলেন না। অসুররা সেই আদিযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিকাশের ধারাবাহিকতা নির্মমভাবে বজায় রাখতে পেরেছেন। বল্কলধারী, খোঁচা খোঁচা চুল, কাঁচাখেকো দুর্গন্ধী রাক্ষস থেকে আধুনিক পোশাকধারী ফিটফাট। বিলিতি সুগন্ধীর সুবাস অঙ্গে। পেটে কলকলে স্কচের কলরব। শরীরে লেপ্টে আছে রুপোলি রূপসী। সর্বাঙ্গে 'সেলফোন'। এটায় দুবাই, ওটায় ব্যাঙ্কক, সেটায় সিঙ্গাপুর। যেমন খেতে পারে সেইরকম মাল টানতে পারে, 'হেভি সেক্স' আর একটাই কাজ—অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে বাঘের বদলে মানুষ মারো। 'ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশান অ্যাক্ট' অনুসারে একটা ছুঁচো মারাও অপরাধ। মানুষ মারায় কোনও অপরাধ হয় না। বরং পুণ্য হয়। কাপালিকরা নরবলি দিত। হিন্দুরা কাঁচা কাঁচা টাটকা বউদের বুড়ো, আধবুড়ো স্বামীর চিতায় তুলে দিয়ে 'হরি হরি' বলে 'ক্যানিবল' নাচ নাচত। মানুষ তো মরার জন্যই জন্মায়। অর্জুন বলছেন, "সখা! মানুষ আমি মারতে পারব না। আমার হাত কাঁপছে পা কাঁপছে।"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ননসেন্স! আমি ভগবান বলছি, কেউ বেঁচে নেই। আমি সব মেরে খাড়া করে রেখেছি। দুর্গাপুজোর আগে নতুন বাজারের আখের মতো। তুমি শুধু একধার থেকে দনাদ্দন নামিয়ে দাও। ব্রাদার! জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, শোক নেই। অনুশোচনা নেই, পাপ নেই, পুণ্য নেই।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও সখা, সবই তো নেই করে দিলে, আছেটা কী?"

"আছে একটা মজা।"

"সেটা কী?"

"সেটা হল—'আছে' মনে করলে 'আছে', 'নেই' মনে করলে 'নেই'।

এই অব্দি এসে প্রশ্ন হল, 'সুখ, শান্তি, আনন্দ কীভাবে পাওয়া যায়!'

স্বামীজী শিষ্যকে বলছেন,

'ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবন সমস্যার রহস্যভেদ কিছুতেই হবার নয়।

ত্যাগ-ত্যাগ-ত্যাগ। সর্বং বস্তু ভয়ালিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং।'

কোনওদিন শুনেছ, চোর এসে
সাধ করে ধরা দিচ্ছে! চোর সব সময় পালায়

সেকালটাই ছিল মজার কাল। সবেতেই মজা। বাড়িতে চোর পড়লেও মজা। চোরেরাও ছিল অন্যরকম। প্রকৃতই অভাবী মানুষ। পেটের দায়ে চোর। ছিঁচকে চোর। ঘটি, বাটি, গামছা, জামা, লোহার বালতি, তোলা উনুন, কেরোসিন তেলের বোতল, হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাইতেই সন্তুষ্ট। কোনওক্রমে রান্নাঘরে ঢুকতে পারলে সেই মাঝরাতেই হাপুস-হুপুস করে খানিক পায়েস খেয়ে নিলে। কোনও ইজ্জত ছিল না তাদের। চরিত্রে আত্মসম্মান বোধটাই অনুপস্থিত। সেকালের চোর ধরা পড়লে গণপিটুনিতে মরত না। ভোর হওয়ার আগেই চড়-চাপড় দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। সে ছিল শান্তির কাল।

একদিন মাঝরাতে চোর এসেছে জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে। খাটের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছে, ঘুম কতটা গভীর! জ্যাঠামশাইয়ের ভরাট মুখে অসাধারণ একজোড়া গোঁফ ছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে, হ্যান্ডলবার মুস্ট্যাশ। গোঁফ জোড়া দেখে চোর মুগ্ধ। আলতো করে টেনেছে।

জ্যাঠামশাই ঘুমোতে ঘুমোতেই বলছেন, "আসল, আসল। বিরক্ত না করে ডিবেতে কাশীর জর্দা দেওয়া পান আছে, দুটো খিলি মুখে পুরে চলে যা।"

চোর বললে, "কত্তা, রাতে খাওয়াই জোটেনি। শুধু শুধু পান খেয়ে কী করব!"

খুব রেগে গিয়ে জ্যাঠামশাই বলছেন, "হতচ্ছাড়া! রাতের খাবারটাও জোটাতে পারিস না, চুরি করতে এয়েছিস!"

বালিশের তলা থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে চোরকে দিয়ে বললেন, "নে ধর।" পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে চোখ বুজিয়ে।

চোর বললে, "কত্তা, মাথাটা একটু তুলুন না, দেখি বালিশের তলায় আর কী আছে!"

জ্যাঠামশাই বললেন, "সমান দু'ভাগ করেছি। বউয়ের তবিল থেকে দশ ঝেড়েছিলাম, তোর পাঁচ আমার পাঁচ। একেবারে ন্যায় বিচার! ওই পাঁচও দিতে পারি যদি আমার পা দুটো একটু টিপে দিস।"

"সে আমি দিচ্ছি খন, তোমার ঘরে খাবার-দাবার কিচ্ছু নেই?"

"গাছপাকা দুটো আতা আছে তাকে। খবরদার, ঘরের মেঝেতে বিচি ফেলবি না।"

রাত আড়াইটের সময় আতা খেয়ে চোর পা টিপতে বসল। আবার জিজ্ঞেস করল, "কাল কি এই টাইমে আসব?"

দুঃখ মেশানো গলায় জ্যাঠামশাই বললেন, "সুখের দিনের আজই শেষ রাত্তির, কাল সকালেই ফিরে আসছেন বাপের বাড়ি থেকে। তুই বরং একটা কাজ করতে পারিস, এক ফাঁকে এসে বলে যেতে পারিস, টাকা দশটা তুই নিয়েছিস।"

চোর বললে, মাপ করো কত্তা। মাঠাকুরণকে আমরা খুব চিনি। টাকা তুমি ফিরিয়ে নাও।"

"আর আতা!"

"কত্তা, সে তো খেয়ে ফেলেছি। এই লাইটারটা কাল চুরি করেছিলুম। তুমি রাখো। যা হয় কোরো।"

আর একদিন, চোর মাঠের উপর দিয়ে দৌড়চ্ছে, পিছন পিছন আমার বলশালী কাকাবাবু ছুটছেন, ব্যায়ামবীর। তার পিছনে আমরা। ওপাশে জোর মুখ ঘুরিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে, এ-পাশে আমার কাকাবাবু। মাঝখানের ব্যবধান হাত পঞ্চাশ। এতক্ষণ হচ্ছিল দৌড়ের ওলিম্পিক। এবার রেস্টলিং।

দু'জনেই দুজনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ছে।

চোর বলছে, "কী হল! হিম্মত থাকে এসে ধরো।"

কাকাবাবু বললেন, "হিম্মত থাকে তো তুই আয় না।"

চোর বললে, "কোনওদিন শুনেছ, চোর এসে সাধ করে ধরা দিচ্ছে। চোর সব সময় পালায়, আর চোর পালালে তোমাদের বুদ্ধি বাড়ে।"

"তা পালা, থামলি কেন হঠাৎ! চোর আর ছুঁচো এই দুটোকে আমি ধরি না। আমার ঘেন্না করে। নে নে, ছোট ছোট।"

"আর কত ছুটব। প্রায় এক মাইল হল। সেই গজার মোড় থেকে দৌড় শুরু হয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই তো ব্যাটা আচ্ছা অধার্মিক। চোরের ধর্মই হল পালানো।"

"এতক্ষণে এটা তো বুঝেছ, আমি তোমার চেয়ে জোরে দৌড়ই। ইচ্ছে করলে পালাতে পারি।"

"তা পালাচ্ছিস না কেন?"

"কী করে পালাব? তোমাদের বাগানে কৃষ্ণকলির ঝোপে আমার মাল পড়ে আছে যে!"

"তোর চোরাই মাল আমাদের বাগানে! নিয়ে যা, নিয়ে যা।"

চোর আর কাকাবাবু দু'জনে গল্প করতে করতে ফিরে এলেন। যেন গলায় গলায় বন্ধু। দাওয়ায় বসে কাকাবাবু বললেন, "আয় বোস, একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। দৌড়টা বেশ ভালই হল, কী বল? তামাক সাজতে পারিস?"

"তা আর পারি না?"

"যা, ওই ধারে সব আছে। টিকে, দেশলাই, দুটো হুঁকো, অম্বুরি তামাক। ভাল করে সেজে আন।"

দু'জনে আয়েস করে তামাক খেতে লাগলেন। ওদিকে ভোর হতে শুরু করেছে। এই চোর কালু কিছুদিনের মধ্যেই কাকাবাবুর ব্যবসায় কাকাবাবুর ডান হাত হয়ে গেলেন।

আরামবাগে কাকাবাবুর বিরাট কাপড়ের আড়ত। কালীবাবু বিশ্বাসী ম্যানেজার। ভীষণ খাটিয়ে।

বেশ কিছুদিন পরে কাকাবাবু বললেন, "কালু, এইবার একটি ভাল মেয়ে দেখে তোর বিয়ে দেব।"

কালু বললে, "আবার? ওই চক্করে আর পা দিচ্ছি না।"

"সে কী রে! বিয়ে করিছিলিস? তা বউ কোথায়?"

"চুরি হয়ে গেছে।"

এখন তাই ভাবি, এই হাইটেক যুগে এইরকম সৎ চোর আর দেখতে পাওয়া যাবে না। আর রসিক গৃহস্থ! আমার দাদু, চোরের কাঁঠাল কাঁধে করে চোরের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছেন!

ভোরের আগেই খুলে গেল
শহরে ঢোকার দরজা

পুরাণের গল্পের দূরদৃষ্টিতে ভারতীয় ঋষিদের বিস্ময়কর ভবিষ্যৎদর্শন ক্ষমতার প্রকাশ আছে, যেমন এই কাহিনিটি। গ্রামের এক সামান্য মানুষ। তাঁর হঠাৎ মনে হল, গ্রামে পড়ে থাকলে কোনওদিন ভাগ্য ফিরবে না, বরং শহরে যাই। সেখানে অনেক সুযোগ। হাঁটতে হাঁটতে, অনেক পথ পেরিয়ে সেই মানুষটি যখন শহরের বাইরে এসে পৌঁছলেন তখন রাত হয়েছে গভীর। শহরে ঢোকার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

উপায়? গভীর এই রাতে আর তো কোথাও যাওয়া যায় না। তা হলে এই দরজার বাইরেই শুয়ে পড়া যাক। কাল সকালে প্রবেশদ্বার যখন খুলবে তখন ঢোকা যাবে শহরে। এতটা পথ হেঁটে আসার ক্লান্তিতে শয়ন মাত্রই গভীর ঘুম। রাত প্রায় শেষ হয়-হয়, এমন সময় পরিব্রাজক সাধু এসে হাজির। তিনি দেখছেন পায়ের উপর পা তুলে একটি লোক ঘুমোচ্ছে। সাধুর হঠাৎ নজরে পড়ল, লোকটির পায়ের তলায় রাজা হওয়ার একটি স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। তা হলে? রাজচিহ্নধারী মানুষটি কেন পথের ধুলোয়? কারণ? সাধু কারণ খুঁজে পেলেন। পায়ের উপর পা তুলে শোওয়া যে

নিচের কাক তারের কাককে ডাকল, "ও গো, দেখবে এসো, দেখবে এসো।"

দুই কাকে কথা হচ্ছে :

"মানুষের কাণ্ড দেখো। মানুষ হওয়ার জন্যে পৃথিবীতে এসেছিল। সদ্য। এখনও লাল। মানুষ করার বদলে ফেলে গিয়েছে নর্দমার ধারে।"

"ফেলে দিলে কেন! বড় করলে কত বড় হতে পারত!"

"কে বলতে পারে, কালে পার্কের স্ট্যাচুও হতে পারত। আমাদের বিশ্রামের জায়গা। মানুষের কী আক্কেল।"

"ভাবো, আমরাও তো এই সিজনের বাচ্চা তুললুম, আমি ডিমে আর তুমি ডালে—চৌকিদারিতে।"

"আশেপাশের ছাতে মানুষ দেখামাত্রই ঠুকরে শেষ করে দিয়েছি।"

"বেশ করেছ। অবিশ্বাসী, নিষ্ঠুর জানোয়ার। দেখছ না, এই ছোট্ট কচি হাতটা মায়ের হাত ধরতে চেয়েছিল। মা টিপে ধরল গলা। ওই ছোট্ট মাথাটা মায়ের কোল খুঁজেছিল, খুঁজে পেল মৃত্যুর কোল। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে ঘড়ির কাঁটা একপাক পুরো ঘুরল না। এ কেমন মা।"

"তুমি জানো না? মন্দিরে আছে মানুষের মায়ের মূর্তি। ওরা বলে জগদম্বা, বলে মা ভবতারিণী। চেহারাটা দেখেছ? আমাদের চেয়ে কালো। এতখানি জিভ সামনে ঝুলছে, টকটকে লাল। ঠোঁট দুটো দগদগে লাল। পুরোহিত বলেন, মা, রুধির পান করেছেন। একজন পুরুষ পায়ের তলায় চিত হয়ে পড়ে আছেন। শুনলুম, ওদের ওই মায়ের স্বামী। পতিদেবতাকে পা দিয়ে চেপে রেখেছেন জগতের মা।"

"অমন বিয়ে না করলেই হত।"

"কী করবে? প্রেমের ফল। পুরোহিত বললেন, ওই পুরুষটি সব পুরুষের প্রতিনিধি। পায়ের তলায় চেপে ধরে আছেন বলেই শিব। ওই ভাবে পড়ে থাকলেই জগতের মঙ্গল। ছাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়ালেই কেলেঙ্কারি, তখন রুদ্র। মায়ের এক হাতে খাঁড়া। ধার আছে বোঝাবার জন্যে একটা মুণ্ডু কেটে বাঁধাকপির মতো হাতে ঝুলিয়ে রেখেছেন। অপর দুটো হাতের ভঙ্গিতে ওরা দেখছে অভয় আর বরাভয়। আমি দেখলুম, টাটা গুড বাই। কানে শুনলুম, মানুষের মায়ের কাছে মৃত্যু ছাড়া কিছু চাস না।"

পরিত্যক্ত নবজাতকটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কাকদুটো অতঃপর উড়ে গেল। এরপর ময়লার গাড়ি আসবে। সব চিহ্নই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ছুটন্ত ধাবন্ত মানুষে নিজেদের পদচিহ্ন নিজেরাই মুছে দিতে দিতে এগিয়ে যাবে চিহ্নহীন অনস্তিত্বের দিকে।

"এই?" "কে?" "আমি ল্যাম্প পোস্ট। একটু আগে প্রেম এখানে দাঁড়িয়েছিল জানো! এই স্তম্ভে আলো আর জ্বলে না—ফিউজ।"

আজকাল ইজ্জতও পকেটমারি হয়ে যায়

"আমার প্রচুর টাকা। বীভৎস রকমের টাকার মালিক। বাড়িখানা যেন ইন্দ্রপুরী। বাড়িতে ঢোকার সময় নিজেই অবাক হয়ে যাই। কী ছোটলোকের মতো ব্যাপার! এ-পাশে, ওপাশে মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে ধুঁকছে, মরে যাচ্ছে বলব না, অনর্থক বিতর্কের সৃষ্টি হবে। আমার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। 'গুড বুক' থেকে 'ব্যাড বুকে' চলে যেতে কতক্ষণ। বাড়িটার পিছনে লোকটা লাখ পঞ্চাশ টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছে ইতরের মতো। অর্থের অসভ্য নির্লজ্জ প্রদর্শনী।"

"আরে লোকটা তো তুমি!"

"তাও তো বটে।"

"অ্যায় দেখো, ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছ। নিষ্ঠুর, দৈত্য না হলে পৃথিবীতে এসে ভোগ করা যায় না। চোখ কান বুজিয়ে মজা লুটে যাও। তুমি গরিব বলে আমি

বড়লোক হব না!"

"কিন্তু!"

"আবার কিন্তু কিসের?"

"সেদিন একটা কথা কানে উড়ে এল। একজন বলছে, বড়লোক মানে, জ্ঞানী লোক, গুণী লোক। যেমন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, সুভাষচন্দ্র, এইরকম।"

"রামমোহন রায় সেই কোন কালে মেয়েদের মুখ চেয়ে সতীদাহ রদ করালেন, বিলেতে গিয়ে অর্থাভাবে প্রাণ হারালেন। এখন ঘরে ঘরে বধূ নির্যাতন। ঝুলিয়ে মারা, পুড়িয়ে মারা। এখন আবার শুরুতেই শেষ করার পদ্ধতি চালু হয়েছে। কন্যাসন্তান জন্মানো মাত্রই খুব ভাল করে কাগজ-টাগজ মুড়ে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে আসছে। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ একটা কংস মেরেছিলেন, এখন দিকে দিকে কংস। আইসিএস সুভাষচন্দ্র দেশ স্বাধীন করতে গিয়ে চিরতরে হারিয়ে গেলেন, লস্ট ফর এভার। গদিতে বসে পড়লেন যাদব, মাধব। মুখের মেশিনগান থেকে গুলির বদলে বুলি। আর দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর লোকান্তরিত হওয়ার পর দু'বেলা দুটি আহারের জন্য তাঁর কন্যাকে ভিক্ষা করতে হল।"

"এই ত 'মরাল সাপোর্ট' এসে গেল। আমার টাকা আছে, মোটা টাকা 'ডোনেশন' দিয়ে ছেলেকে নামী স্কুলে ভর্তি করেছি, ব্যাটা মাস্টারের এত বড় আস্পর্ধা, আমার সোনার চাঁদের গায়ে হাত তুলেছে। দেখাচ্ছি মজা! এই কে আছিস?"

"ইয়েস স্যার।"

"আমার উকিল ভোলাকে ডাক।"

"আবার কী হল?"

"একটা ফাইভ ফিফটি ফাইভ, ফৌজদারি ঠুকে দাও।"

"কেসটা কী"?

"আমার ছেলের গায়ে হাত তুলেছে এক ব্যাটা পাতি মাস্টার। আমার ছেলে সিগারেট খাক, বিস্কুট খাক, মদ খাক, জুয়া খেলুক, তাতে মাস্টার নাক গলায় কোন সাহসে।"

"ঠিকই তো, ঠিকই তো! আগে একটা 'এফআইআর' মেরে আসি।"

"ছেলেকে স্কুলে পাঠালেন, মাস্টারমশাই শিক্ষা দেবেন না?"

"না।"

"তা হলে তাঁরা কী করবেন?"

"মাস্টাররা মাস্টারদের দিকে মাস্টারদের মতো থাকবে, ছেলেরা ছেলেদের দিকে। কোনওরকম হস্তপ্রয়োগ চলবে না। গুণ্ডা মেরে ঝাণ্ডা উড়িয়ে সব শেষ করে দেব। পাঠশালার যুগ শেষ।"

"ছেলের ডিগ্রি, ডিপ্লোমার কী হবে?"

"কিনে আনব। টাকা ফেললে তিনদিনের মধ্যে মাল এসে যাবে। আজকাল নোবেল প্রাইজও কিনতে পাওয়া যায়।"

হাজত দৃশ্য

পকেটমার : "কী করেছিলে গুরু? চেহারা দেখে তো ভদ্দরলোক বলেই মনে হচ্ছে?"

শিক্ষক : "আমি শিক্ষক।"

পকেটমার : "ও বাবা! সে তো গুরুর গুরু। শিক্ষাগুরুরা তো আমার গুরুর চেয়েও বড়। জাল মার্কশিট, জাল ডিগ্রি, প্রশ্নপত্র ফাঁস, পদক, পাণ্ডুলিপি চুরি, স্কুল তহবিল হাপিস, ছাত্রীকে রেপ। গুরু, গুরু। তা তোমার ডিগ্রি কোত্থেকে কিনেছিলে? শিকাগো? দেখেআমি পকেট মেরে হাজতে আর তুমি ডিগ্রি ঝেপে আমার পাশে। লাও একটা বিড়ি ধরো।"

শিক্ষক : "বিড়ি খাই না।"

পকেটমার : "আরও উপরে উঠে গেছ? গাঁজায় আছ বুঝি?"

শিক্ষক : "না গোঁজায় আছি।"

পকেটমার : "আহা। গোঁসা করছ কেন? কেসটা কী?"

শিক্ষক : "ক্লাস সেভেনের ছেলে তাসের জুয়া খেলছিল, ধরে, ঠাস করে এক চড়, হাজতে।"

পকেটমার : "অমানুষের দেশে মানুষ তৈরি করতে গেছ। হা, হা, তুমি কেমন অমানুষ হে?"

শিক্ষক : "তোমার মতে আর কী করা উচিত?"

পকেটমার : "আমি আর কী বলব স্যার, আপনি শেয়াল পণ্ডিকের কাছে যান। গুরুর গুরু মহাগুরু। স্যার, একটা 'আডভাইস'। শুধু মানিব্যাগই পকেটমার হয় না, ইজ্জতও মার হয়ে যায়। সামালকে। যেরা দেখকে চলো, আগে ভি দেখো, পিছে ভি দেখো।"

সবচেয়ে ভীতিপ্রদ
মদতপুষ্ট কিছু মানুষ

অনেক ভাল আছেন। বিভিন্ন বড় বড় জায়গায় ঘাঁটি আগলে বসে আছেন। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বড় বড় কথা বলছেন। বহুতলের 'মিনি'-বাগান বারান্দা থেকে খালি সিগারেটের প্যাকটের মতো, নিচের দিকে জ্ঞান আর উপদেশ ছুড়ছেন। মাঝে মাঝে ভোঁ-ভোঁ করে বিদেশে উড়ে যাচ্ছেন। কোল্যাপসিবল গেট লাগানো সুরক্ষিত, উন্নাসিক পরিবার। দয়া করে এদেশে আছেন। কৃপা করছেন। কাকে করছেন?

অনেকেই কিন্তু ভাল নেই। শোচনীয় অবস্থায় স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে খাবি খাচ্ছেন। যে-দেশের বড় কর্তাদের এখনও সায়েব বলা হয়, সে দেশের আশা, ভরসা আছে কি?

কেউই ভাল নেই। সব মানুষকে নিয়েই একটা দেশ। ফল আর ফলের বিচি। তিনের চার ভাগ পচে গেলে একের চার ভাগে পচন ধরতে বাধ্য। ওপরতলার ঘৃণায় নিচের তলার ক্রোধ বাড়তে বাড়তে ক্ষিপ্ত আকার ধারণ করেছে। আগুনে ঘৃতাহুতি।

মন্ত্র, 'ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও।'

প্রচুর কথা, স্লোগান, নির্দেশ, উপদেশ বাতাসে ভাসছে। কে কার কথা শোনে! একটু একটু করে ভয়ঙ্কর রকমের একটা মারকুটে জাত তৈরি হয়েছে। ভাষা হয়েছে খুন। কথায় কথায় ছুরি ছোরা। মারো। হয় অন্যকে মারো না হয় নিজেকে মারো। মেরে ফেলো। চুরমার করে দাও। ছেলেমেয়ের চোখের সামনে মদ্যপ বাপ মুখে বালিশ চেপে ধরে বউকে মেরে পলাতক। ঘরে ঘরে মেয়েদের কী অবস্থা! সবই হচ্ছে, কে যে কখন মরবে জানা নেই। স্বামীর আজ চাকরি আছে তো কাল নেই। কয়েকটি বিষণ্ণ মুখে করুণ দৃষ্টি। ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া শেখানো গরিবের পক্ষে সম্ভব নয়। বিরাট খরচ। যারা বেড়ে উঠছে তাদের সামনে কোনও ভবিষ্যৎ নেই। উঞ্ছবৃত্তিই একমাত্র পথ। দাম্ভিক শাসক গোষ্ঠী শাসনের যে পদ্ধতি বের করেছেন, সে-পথে আশার আলো নেই, থমথমে ভয়ের থকথকে অন্ধকার। সর্বত্র জুজুর ভয়। বাঘ, সিংহ, হায়না, শেয়াল নয়, সবচেয়ে ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছে মদতপুষ্ট এক ধরনের মানুষ। এরা কেল্লায় থাকে, সম্রাটের সিংহাসন রক্ষা করে।

বহু স্তর তৈরি হয়েছে। বহু স্তর পেরিয়ে রাজার কাছে খবর আসে। মোগল আমলের কেতা।

'কোথাও কোনও বিদ্রোহের খবর আছে, চর?'

'জাঁহাপনা অমুক মহল্লায় একটু গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর শুনে এলুম।'

'কারণ?'

'বলছে, রাস্তাঘাটের শোচনীয় অবস্থা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, স্কুল নেই, পানীয় জল নেই, রোজ রাতে ডাকাতি, জীবিকা নেই। চোলাই খেয়ে পুরুষগুলো চেল্লাচ্ছে। নারী নিগ্রহ, ধর্ষণ।'

'আমাদের প্রচার যন্ত্রের দম ফুরিয়ে গেল না কি? মোড়ে মোড়ে, হাটে বাজারে দাঁড়িয়ে চেল্লাতে পারছে না, 'ফিল গুড। তোমরা ভাল আছ, খুব ভাল।'

'সমস্বরে পাল্টা চেল্লানি—না, আমরা ভাল নেই। আমরা মরে যাচ্ছি, আমাদের মেরে ফেলা হচ্ছে।'

'মরে যাওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণটা বোঝাতে পারছ না। হার্টের জোরে মানুষ বাঁচে, ফেল করলেই ফেল হয়ে যায়। ভাল করে বুঝিয়ে দাও, বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা ভয়ঙ্কর রকমের একটা কুসংস্কার। সবরকমের কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার দিন এসেছে। সবাইকে বেঁচে থাকতে হবে? মামার বাড়ি! যন্ত্রপাতি দিয়ে আমাদের বিজ্ঞান বাহিনীকে পাঠিয়ে দাও। শিখিয়ে দাও, বেশি কথা বলা খুব খারাপ। অনেক কথার অনেক দোষ, ভেবেচিন্তে কথা কোস। বোবার শত্রু নেই।

কৃত্রিম বড়লোক হওয়ার চেয়ে অকৃত্রিম ভিখিরি হওয়া ভাল

আমার আর একদিনও বাঁচতে ইচ্ছে করে না। তোমার? একই অবস্থা। রোজ সকাল হলেই ভাবি, এই রে আবার একটা দিন এল। সেই একই ঘ্যাচোর ম্যাচোর। লোকে গুঁতোচ্ছে, অটোম্যাটিক অটো তেড়ে আসছে। ছাত্রছাত্রীরা কৃত্রিম উচ্ছ্বাসে ভবিষ্যৎশূন্য-বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে চলেছে। স্যান্ডো গেঞ্জি পরে সেই একই লোক কাটাপোনা বিক্রি করছে। সেই একই মেজাজে গৃহিণী স্বামীকে দম দিচ্ছে। সেই একই কায়দায় কলকাতায় কাজের মহিলা থালাবাটি শাসন করছে। আধবোজা চোখে পাড়ার নেতা ফুলো-ফুলো মুখে একই কথা বলে চলেছে। পুলিশ একই কায়দায় লরির সঙ্গে লড়ছে। ড্রাইভার উঁচুতে বসে একই কায়দায় থুতু ফেলছে। শামলা পরা উকিল একই মামলা লড়ে যাচ্ছে। প্রেমিক একইরকমের চিঠি ভুল বানানে লিখে চলেছে—পেয়সি, জীবন পেপসির বুজকুড়ি কমে আসছে তোমার পেমের কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়া। পাসও করব না, চাকরিও পাব না, বিয়েও হবে না। তোমার মাদারকে বলো, সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়, আমাকে যেন ঘরজামাই করে। তা না হলে মেট্রোয় বডি ফেলে দিয়ে, ইলেকট্রিক ভূত হয়ে রোজ লোডশেডিং করে দেব।

অফিসে রোজই সেই এক হুমদো মুখ। মহিলা কর্মীদের সঙ্গে সে কী গদগদ গদাগদি। প্যান্টুলুন বুঝি হড়কে যায়। মুখে আলুভাতে পুরে কথা বললে যেমন শোনায়, গোবরের গাদায় থপথপে ব্যাং, সেই রকম গলায়, "অমৃতা, অমৃতা, তুমি আমায় একটুও দেখছ না। নটি গার্ল। তুমি কি চাও আমি আত্মহত্যা করি।"

অমৃতা ঘোড়েল মেয়ে, বিয়ের আগেই তিনবার 'ডিভোর্স'।

"বিয়ের আগে ডিভোর্স!"

"আরে এ বাংলা বিয়ে নয়, ইংরিজি B.A.। মাধ্যমিকের প্রেমিক মাধ্যমিকেই পড়ে রইল। উচ্চমাধ্যমিকে আর এক পতঙ্গ এল। ওড়া-উড়ি। ডানা ভেঙে কাত। বি এতে আর একটি এল। তাকেও হালুয়া করে দিলে। যেন রুমালি রুটির কারখানা। ফাড়াক, ফাড়াক করে বাতাসে বার কতক ঘুরিয়েই তাওয়ায় ফেলে দাও। রোটি বন যাও। আসলে একটি ঘড়িয়াল। ফড়কায়তি, চমকায়তি ইন আওয়ার কোম্পানি। তিনি বললেন, "বাড়িতে তো আপনার একটি জলজ্যান্ত বউ আছে।"

"সো হোয়াট অমৃতা! সি ইজ এ ব্যাগেজ। ইও আর মাই লাভ।"

"এই হুমদো কখনও বাঘ, কখনও বেড়াল। কখনও 'স্লাই ফক্স'। স্লাই ফক্স-এর বাংলা হল সেলাই করা খ্যাঁকশিয়াল।"

"বলছ, বাঁচার ইচ্ছে নেই ; কিন্তু বেঁচে তো আছ!"

"আরে আর একজন যে মরতে বসেছে। আমার বউয়ের ক্যানসার ধরা পড়েছে। তাকে টেনে রাখার জন্যে বেঁচে আছি। সে যখন হাত দুটো চেপে ধরে বলে, 'আমি চলে যাওয়ার পর তোমাকে কে দেখবে!' তখন কী মনে হয় জানো! দুটো হাই টেনসান লাইন—একটা পজেটিভ, একটা নেগেটিভ। পজেটিভ লাইনে এক জোড়া পাখি। ন্যাজটা 'বাইচানস' নেগেটিভে ঠেকলেই 'ফ্ল্যাশ অ্যান্ড মরে কাঠ।' এখন আমার 'ডিপ্রেশন' নেই। বাঁচতে বেশ ভাল লাগছে।"

"সে কী?"

"হ্যাঁ জীবনের শেষটা দেখব। আমি পালার দর্শক। 'ট্র্যাজিডি' হয় কি 'কমেডি': আমি এখন যোদ্ধা। নিজের 'কিংডম' সামলাচ্ছি। মোটরবাইক বেচে দিয়েছি। ফিকসড ডিপোজিট ভেঙে ফেলেছি। তেমন হলে ফ্ল্যাটটাও বেচে দেব। স্বার্থপর কৃত্রিম বড়লোক হওয়ার চেয়ে, অকৃত্রিম ভিখিরি হওয়া ভাল। নদীর তীরে বসে দেখছি, জোড়া হাঁসের একটা হাঁস জোড় ভেঙে ভেসে যেতে চাইছে অন্ধকার আকাশের দিকে। ফেরাতে না পারি আলো তো দেখাতে পারি। বুঝলে ভায়া—ডিপ্রেশনের আর এক নাম স্বার্থপরতা। অন্যের বাঁচার অংশীদার হতে না পারলে জীবনকে মৃত্যুর ছায়া থেকে টেনে বের করা যাবে না। আচ্ছা ভাই চলি। আজ থেকে 'কেমো' স্টার্ট হবে।"

কেউ যায় বাজারে মাছ কিনতে,
কেউ যায় এভারেস্টে উঠতে

মানুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, বলেছিলেন সঞ্জীব চন্দ্র। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই বুঝতে পারি, একেবারে সেন্ট পারসেন্ট খাঁটি সত্য। প্রথমে চমকে উঠি, কে রে এটা! ঝুলঝাড়ুর ক্ষুদ্র সংস্করণ না কি! বেঁটেখাটো। চুলের কী অবস্থা। কোলে করে সিলিং-এর দিকে ঠেলে তুলে দিলেই হয়। এক লট ঝুল নিয়ে নেমে আসবে। কোথায় গেল আমার সেই চাঁচর চিকুর! ঘাড়ের কাছে সেতারির বাবরি। ওই যে দেয়ালে কেতরে আছে যৌবনের ছবি। বুকের কাছে লেপটে আছে যুবতী স্ত্রী। কপালে এতখানি একটা টিপ সাঁটা। টলটলে মুখ। দু চোখে টইটম্বুর প্রেম। বিয়ের কয়েকমাসের মধ্যেই স্টুডিওয় গিয়ে পোজ মেরে তোলা। নেই। যৌবন লিক করে বেরিয়ে গিয়েছে। সংসারের থার্ড ডিগ্রিতে গাল ভেঙে গিয়েছে। গলাটা গোহাড়গিলের মতো। চাষের খেতে পাঞ্জাবি পরে দু-হাত তুলে দাঁড়ালে মনে হবে কাকতাড়ুয়া। যৌবনের গান ছিল, তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর হাসি আর গানে ভরে তুলব। বৃদ্ধের গান, আসার আসা ভবে আসা, আসা মাত্র হল সার। চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, কে রে তুই! মরা কাতলা না কি! দৃষ্টি আছে প্রাণ নেই। কামনা, বাসনা গেল কোথায়! কোথায় গেল চকচকে লোভ! গনগনে অহঙ্কার!

আহত, ভীত, পশুর চোখ! আয়নার মানুষটাকে মনে হয়, আমার পিতা দাঁড়িয়ে আছেন। বলতে ইচ্ছে করে, কী হয়েছে তোমার, কেউ মেরেছে, বকেছে কেউ। এসো তোমাকে ভাল করে তেল মাখিয়ে চান করাই। খুব করুণা হয়। মনে হয়, আমার যা আছে সব দান করে দি ওই লোকটাকে। কত দিন ধরে কত দূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছে। কত অপমান সহ্য করেছে, ধূর্ত লোক ঠকিয়েছে, বন্ধুরা বঞ্চনা করেছে, আত্মীয়স্বজন শত্রুতা করেছে, ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া খেলতে গিয়ে সর্বস্ব খুইয়েছে। হেরে যাওয়া একটা লোক। কী করলে কী সারা জীবন। ধমক লাগাই। আয়নার লোকটা কথা বলে না। ঠোঁট দুটো শুধু নড়ে ওঠে। মুখটা করুণ হয় আরও। লেখাপড়াটা আরও ভাল করে করলে না কেন? তোমাকে কে বলেছিল, সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে মাততে! কে বলেছিল, ল্যাং ল্যাং করে প্রেম করতে। জানতে না, বিয়ে করলে, সংসার হয়। সংসার হলে টাকা রোজগার করতে হয়। দাসত্ব করতে হয়। ঝাঁটা, জুতো, লাথি খেতে হয়। তিলে তিলে মরতে থাকে প্রেমিক, দুমড়ে যেতে থাকে আদর্শবাদী, জীবনের সরলতা ক্রমশ জট পাকাতে পাকাতে হয়ে যায় শয়তানি, দ্বিপদ মানুষ সামনে ঝুঁকতে ঝুঁকতে ক্রমশ হয়ে যায় চতুষ্পদ উল্লুক। জানো না তুমি, মানুষের শেষটা কত ভয়ঙ্কর!

জ্যান্ত ঝুলঝাড়ুটা ইডিয়টের মতো তাকিয়ে থাকে। ষাটটা বছরের সমস্ত ঐশ্বর্য কোথায় ঘুচিয়ে এসে অপরাধী বালকের মতো আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে বলি, "গাধা, বলতে পারছিস না, who breathes, must suffer, and who thinks must mourn.And he alone is blessed, who never was born. যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভিতরে ছটফট করতে চেনে বাঁধা বাঁদরের মতো, তখন মনে হত, কেন এই করলুম না, কেন ওই করলুম না। এখন আর করে না। এখন বুঝেছি, যে এভারেস্টে উঠবে সে এভারেস্টে উঠবেই। যে পাতিপুকুরের বাজারে রোজ সকালে পচা মাছ কিনবে, সে কিনবেই। আমি এভারেস্টে ওঠার চেষ্টা করলে বেস ক্যাম্পেই হেঁচকি তুলে মারা যেতুম। কলেজে যখন পড়ি তখন শেক্সপিয়র হওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। তিনপাতা পড়ে শোনার পর প্রাণের বন্ধু বললে, আর চেষ্টা করিসনি, হেপাটাইটিস হয়ে যাবে। জীবনের পথ ধরে এতটা হেঁটে আসার পর সার বুঝেছি, আমার যা হওয়ার তাই হয়েছে। চাল কুমড়ো চালে, ভুঁই কুমড়ো ভুঁয়ে! নিম তেতো, তেঁতুল টক। দুঃখ করিস না ভাই। জীবনের পার্সেলটাকে ইনট্যাক্ট মৃত্যুর মহালয়ে বিশ্বাসী ডাক হরকরার মতো পৌঁছে দাও।"

প্রকৃত ওস্তাদের কদর নেই,
সমালোচক ও 'মিডিয়া'কে তোয়াজ করতে হবে

একদিন সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলুম সে পালিয়েছে। ফিরবে না কোনওদিন। একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ছিল তার। দুটো বড় বড় নীল চোখ। টান টান মসৃণ ত্বক। দু'সার ঝকঝকে দাঁত। হাসিমাখা মুখ। ভিতরের আনন্দ ফুটে বেরোচ্ছে। সে নেই। সে না বলেই চলে গিয়েছে। জানি সে আর আসবে না। এ এক বিচিত্র অকৃতজ্ঞতা।

যে-শিশুটি সবুজ মাঠে শীতের রোদে দৌড়ত, সে গেল কোথায়। ভোরের কুয়াশা। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ঝাপসা ঝাপসা খেজুর গাছের দিকে। ঝাপসা একজন মানুষ সেইটাতে ঝুলে আছে। তার হাতের নাগালে গোটাকতক কলসি। শিশুটির

রোমহর্ষক ভাবনা রাতের ভূত ভোরের গাছে কোনওভাবে আটকে গিয়েছে। এইবার কী হবে! একটু পরেই যে রোদ উঠবে।

"ও খোকা! ও ভূত নয়। ও হল সিউলি, খেজুরের রস পাড়ছে। নলেন গুড় তৈরি হবে।"

নতুন শব্দ। সিউলি। পণ্ডিতমশাই ভোরবেলা টোলে যাচ্ছেন। যাওয়ার পথে শিশুটিকে শিখিয়ে যাচ্ছেন, "শোন, যখন ফুল, তখন বানান হবে শিউলি। আর যখন রস পাড়ার লোক, কোমরে দড়ি, হাতে কলসি, তখন বানান হবে সিউলি!"

জোড়া পুকুরের মাঝখানের সরু পথ ধরে পণ্ডিতমশাই হাইস্কুলের মাঠের দিকে চলে যাচ্ছেন। টকটকে ফর্সা। দীর্ঘ দেহ। গায়ে খদ্দরের মোটা চাদর। পায়ে খড়ম। শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। মাঠের উপর কুয়াশা ভাসছে। ভোর কেটে সূর্য উঠেছে। চোখের সামনে ভারি মজা। রোদ উপর দিক থেকে কুয়াশা খেয়ে ফেলছে। লম্বা, লম্বা রোদের রেখা নেমে এসেছে মাটিতে। নিচের দিকটা ঝাপসা, উপরদিকে যেন আগুন লেগে গিয়েছে। সেই অদ্ভুত আলোর মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে একটা সাইকেল আসছে। মধুদা। সাইকেলের পিছনে দু'পাশে দুটো দুধের ক্যান ঝুলছে। মধুদার মাথায় একটা কাপড় পাগড়ির মতো করে বাঁধা। কুয়াশা রোদের তাড়া খেয়ে দূরে দূরে পালাচ্ছে। আরও দূরের মাঠে। বকের ডানায়। বিরাট বটের অন্তরঙ্গ শাখায়। দূরের শ্রীনাথদার চালাটা এখনও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেনি। চালের উপরের লাউগুলো ধপ ধপ করছে। শ্রীনাথদাকে ঝাপসা-ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। ব্লটিং পেপারে আঁকা ছবির মতো। কাঠ কাটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। শ্রীনাথদার কাঠের গোলা আছে। আমকাঠ, জামকাঠ, জারুলকাঠ। আর একটু পরেই আসবে হাঁসের পাল। হেলেদুলে। একটাই ভাষা, প্যাঁক প্যাঁক। গামলার মতো ভাসছে থাকবে। ফুরফুরে বাতাসে জলে ফুটবে শিরশিরানি। সেই আনন্দ পেটের তলায় রেখে হাঁসদের টহলদারি।

আকাশ আছে, শিশির আছে, জোড়া পুকুর আছে, হাঁস আছে, স্কুলবাড়িটা আছে, মাঠটা আছে। সেই শিশুটি নেই। আর একটু বড় একটা শরীরের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে। সে এখন কিশোর। তার দৃষ্টি পাল্টে গিয়েছে। কথায় পাক ধরেছে। পরিবেশ পুরনো হয়ে গিয়েছে। বিস্ময় হারিয়ে গিয়েছে। কল্পনা ঢুকে গিয়েছে বাস্তবে। তার অবস্থা তখন ঠেলাগাড়ির মতো। পৃথিবীর প্রবেশপথ যাঁরা খুলে দিয়েছিলেন, তাঁরা এইবার সদলে ভয় দেখাতে শুরু করেছেন। দুটো শব্দ জীবনে ঢুকে পড়েছে, পদার্থ আর অপদার্থ। যার টাকা আছে, সে পদার্থ। যার টাকা নেই অপদার্থ। সেই বিদ্যাই বিদ্যা, যে বিদ্যায় টাকা হয়, গাড়ি হয়, বাড়ি হয়। সে চুরি-বিদ্যা হলেও আপত্তি নেই।

কিশোরের মগজ ধোলাই হয়ে গেল। [illegible] বিনিময়ে জ্ঞান চাই না, চাকতি চাকতি টাকা চাই। আকাশ. বাতাস, নদী, বৃষ্টি, মেঘ বক, সমুদ্র ঢেউ, পূর্ণচন্দ্র, ফালি

চাঁদ, ঝকঝকে তারা, পাহাড়চূড়া, বরফ, উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা, ওসব কবিদের জন্য। কবিরা আবার ওই মশলা দিয়ে টাকা বানাবেন। যশ, খ্যাতি, সভা, সেমিনার, পুরস্কার। একালে একটা নতুন তকমা পাওয়া যাচ্ছে, 'সেলিব্রিটি'। গান শিখলেই গাইয়ে হওয়া যাবে না। এক ধরনের সুরে অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে হবে। তৈরি হবে 'মিউজিক ভিডিও'। যাঁরা প্রকৃত ওস্তাদ তাঁদের কদর নেই। কায়দা করে 'টপ'-এ উঠতে হবে। ব্যাপারটা এইরকম হবে, তুলবে, তুলবে, তারপর ধপাস করে ফেলবে। সুতরাং পয়লা উপদেশ—করিতকর্মা হও। শোনো খোকা, ভাল মানুষ হয়ে লাভ নেই, চালু মানুষ হও। ধর্মও করো দু-নম্বরিও করো।

খোকা কলেজে গেল। তখন গুড়গুড়ে যৌবন। কুয়াশাভাঙা সকালে গ্রামের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা বালকটি নেই আর। সে তলিয়ে গিয়েছে। চারপাশে ঝাঁ-ঝাঁ শহর। সিনেমার হোর্ডিং-এ মোহিনী মায়া। শরীরের জাদু। সেক্স ঢুকছে ছুরির ফলার মতো। প্রেমের জাদুদণ্ড। মনস্তাত্ত্বিক বলছেন, আরে ওইটাই তো সব। জগৎ কামময়। সৃষ্টির উৎস হল কাম। ওইটাই হল ইঞ্জিন। আমি চাই। নারী চাই, বাড়ি চাই, গাড়ি চাই, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা চাই। ভোগ চাই। ফ্রয়েড একটি শব্দ সে দেশ থেকে এ দেশে চালান করে দিলেন 'ইভউ'। পাওয়ার হাউস অফ এনার্জি। প্রতিটি জীবের মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে। এইখান থেকেই উঠছে আমার 'আমি'র ঢেকুর। এইখান থেকেই তৈরি হচ্ছে 'লিবিডো'। কাম। কামের পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। বললেন, মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টাই হল 'সেক্সুয়াল ড্রাইভ'।

সেই ড্রাইভার ঢুকিয়ে দিল সংসারে। মিটে গেল ঝামেলা। ধিনতাকের ব্যাটা তিনতাক। যৌবন জলতরঙ্গে ডাবুডুবু। আদম। তুমি ইভের দাস। বৃথা হম্বিতম্বি করো না। ইভ তোমার দাসী নয়। তুমি বাঘ মারবে। সেই সুন্দর বাঘছালে শোবে তোমার ইভ। তোমার সমস্ত বীত্বের কারণ একটাই, তুমি ইভের চোখে 'হিরো' হতে চাও, যাতে সে তোমাকে আরও ভালবাসে।

শুরু হয়ে গেল 'এজিং'। পাকা চুল, টাক, কুঁচকে গেল দেহত্বক। চোখে আর সে আলো নেই। আয়নার সামনে এটা কে, ধান্দাবাজ, ধড়িবাজ। একে আমি চিনি না।

"আমার সে কোথায় গেল?"

"সে মরে গিয়েছে। তুমিই তার হত্যাকারী।"

আয়না হেসে উঠল, "তোমরা প্রত্যেকে নিজেকে হত্যা করছ। আয়নার আদালতে এসে আততায়ীর মুখ দেখে চমকে উঠছ কেন?"

পৃথিবীর আদি প্রোমোটার বিষ্ণু সাহেবদের বেশি পছন্দ করেন

"এখন সংসার চালানোটা কেমন হয়েছে জানেন? লগবগ করে সাইকেল চালানোর মতো। একটু এদিক-ওদিক হলেই ধপাস।"

"তা চালাচ্ছ কেমন করে?"

'নিজের থেকে চলছে। শামুকের মতো গুটিগুটি। আমরা দর্শক মাত্র।"

"অর্থাৎ ভুতুড়ে ব্যাপার।"

"না, ব্যালান্স-এর ব্যাপার। পুজোর তিন মাস আগে থেকে এক বেলা আহার। সম্পূর্ণ বৈষ্ণব। লম্বা একটা ডাল। একতাল আলুভাতে। সপরিবারে অম্বলের উপাসনা। পেটটা ফুলিয়ে দাও ভগবান। কারও অসুখ করলে, প্রথমে হোমিওপ্যাথি। পারিবারিক গৃহচিকিৎসা খুলে কসরত। কতরকমের জ্বর! পেট থেকে জ্বর। বুক থেকে জ্বর, দাঁত থেকে জ্বর।"

"দাঁত থেকে জ্বর মানে?"

"মাথা থেকে। অসহ্য মাথা ধরা। শুয়ে পড়া। এই ভুরুর কাছটা টিপে ধরছি। আরাম লাগছে? না। আচ্ছা, রগ দুটো টিপে ধরছি। কী বুঝছ? খুব আরাম লাগছে। ভেরি গুড! ভেরি গুড নয়। চাপ আলগা হলেই ফিরে আসছে। ছেলেকে বললুম, মায়ের রগ দুটো টিপে ধরে বসে থাক। সে বললে, আহা! কাল আমার পরীক্ষা। আমার ধান্দা, যাতে ডাক্তার না ডাকতে হয়! স্ত্রীকে বললুম, "তুমি কাত হয়ে শোও। আমি রগে একটা পেপারওয়েট চাপিয়ে দি। দেখো, আমি নিজে গীতায় পড়েছি—যোগ কর্মসু কৌশলম। কর্মের কৌশলকে বলে যোগ। যোগের পথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। শুনেছি, তাঁর বিরাট একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে। তিনি সন্তুষ্ট হলে, গাড়ি চাইলে গাড়ি, বাড়ি চাইলে বাড়ি।"

"এই সংবাদটি তোমায় কে দিলে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ?"

"না, ব্যবসাদাররা। কী সব পুজোর ধুম। নেচে নেচে তারকেশ্বরে। বাবা কৃপা করলে কী না হয়। পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। অন্ধ খবরের কাগজ পড়ে। সাত বিঘে জমির ওপর সাততলা বাড়ি হয়। বউয়ের গলায় হিরের নেকলেস। ফেলু ছেলে আই এ এস। বোঁচা মেয়ের রাজপুত্তুর। এইতো পঞ্চার বউ বারের ব্রত করছিল। পঞ্চা ভুটান লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে ওপর দিকে উঠে গেল।"

"উঠে গেল মানে?"

"স্বর্গে চলে গেল।"

"সে কী?"

"শকে মারা গেল।"

"তা হলে আর কী হল?"

"ওই তো। ভগবান গরিবদের পছন্দ করেন না। পঞ্চাননকে বড়লোক করে কাছে টেনে নিলেন। এখানে চান করত পানা পুকুরের জলে। ওখানে গায়ে আতর মেখে মন্দাকিনীর জলে চান করে। রম্ভা তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে দেয়। উর্বশী ককটেল সার্ভ করে। মেনকা পা টিপে দেয়। রাত্তিরে ইন্দ্রের পার্টিতে গিয়ে কুবেরের পাশে বসে। মহাদেব মোয়া খাওয়ান। বিষ্ণু পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ করেন।"

"পশ্চিমবঙ্গ তো একটি রাজনৈতিক জোট দীর্ঘদিন শাসন করছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু কী করবেন!"

"একটা ব্যাপার ভুল কোরো না। এই পৃথিবীর আদি প্রোমোটার বিষ্ণু। তিনি আবার সাহেবদের বেশি পছন্দ করেন। ইউরোপ, আমেরিকার দিকটা ফাটিয়ে দিয়েছেন। কী ডেভেলপমেন্ট! স্বর্গের ছাঁচে তৈরি। মানুষগুলোকে কী তৈরি করেছেন। সাদা-সাদা। আর মেয়েরা। ছবি দেখলেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া। জ্যান্ত সামনে এসে দাঁড়ালে হার্ট ফেল। আমাদের দিকটা লর্ড বিষ্ণু একেবারে 'নেগলেক্ট'

করেছেন। আমার চেহারাটাই দেখো না। বেঁটে বক্কেশ্বর। তামাটে গায়ের রং। যিশু খ্রিস্টের মতো লম্বা-লম্বা চুল রাখার চেষ্টা করেছিলুম। চুলের 'বিউটি'তে যদি 'অ্যাপিয়ারেন্স'-টা একটু খোলে। পাতকোর জলে চানের চোটে, সামনের দিকটায় অচিরেই টাক পড়ে গেল। যত চুল ঘাড়ের দিকে। এখন সকলের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াই। আমি বলি, যা বলার বলে যাও, আমার পেছনটাই সামনে।"

"মানুষের যেমন ছিরি। দেশটারও সেইরকম ছিরি। এক হাঁড়ি দই নিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে টালা থেকে টালিগঞ্জে যাচ্ছিলুম। ট্যাক্সিতে বসে বসে নাচছি। ব্যাঙের নাচ, 'ফ্রগ ড্যান্স', 'ব্রেক ড্যান্স'। যখন পৌঁছলুম, দই আর দই নেই, ঘোল হয়ে গিয়েছে। বেয়ান সেটি আমার মাথায় ঢেলে দিয়ে বললেন, "বাড়ি যান।"

আমরা লগবগ আর টগবগ করে বেঁচে আছি। এক সময় ঘোড়া ছিল তুর্কি আর মুঘল রাজপুরুষদের বাহন। প্রজাদের বাহন গরু। গাধার পিঠে চাপতেও আপত্তি ছিল না।

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের বাহন ছিল গাধা। আমাদের দেবী শীতলা গাধাকে বাহন করেও জাতে তুলতে পারেননি। মা শীতলার পূজায় গাধা-পূজার কোনও মন্ত্র আছে কি?

'আচ্ছা গাধারা সব গেল কোথায়?"

"বোধ হয় মানুষ হয়ে গিয়েছে।"

ভারতের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ হল অ্যাপেনডিক্স

"বলো, গণতন্ত্র কাকে বলে?"

"যে-তন্ত্রে জনগণের কোনও অস্তিত্ব নেই।"

"ভেরি গুড। দশে দশ। আচ্ছা, এইবার বলো, নির্বাচন কাকে বলে?"

'নির্বিচারে বচন ঝাড়াকে নির্বাচন বলে।"

"আবার দশে দশ। বলো, আইন কাকে বলে?"

"আইনের অনেক ধারা, যা হবে নয়নধারা।"

"শাবাশ, দশে দশ! বলো জামিন কাকে বলে?"

"নেতা, আর অভিনেতাদের জেলে যেতে হয় না। ওই জামিনের জোরে জমিতে ঘুরে বেড়ায় সারা জীবন।"

"কেয়া বাত! এবার বলো, শাসন কাকে বলে?"

"এমন ব্যবস্থা, যাতে বদমাইশরা বাইরে থাকে, সাধুরা জেলে থাকে।"

"সংস্কৃতি কাকে বলে?"

"সব রকমের দুষ্কৃতিকে সংস্কৃতি বলে।"

"নির্বাচনী পথসভার বক্তৃতা কে শোনে?"

"যিনি বলেন, তিনিই শোনেন।"

"নেতা চেনা যাবে কী করে?"

"সমস্ত মানুষ যাঁর চোখে ন্যাতা, তিনিই নেতা।"

"পুলিশদের কর্তব্য কী?'

"লরির দিকে শ্যেন দৃষ্টি রাখা।'

"রাজনীতির প্রধান অস্ত্র কী?"

"বন্‌ধ।"

"বন্‌ধ কত রকমের?'

"লেজিটিমেট আর ইল্‌লেজিটিমেট।"

"ব্যাখ্যা?"

"স্বামী সহবাসে যে-সন্তান উৎপন্ন হয় তা বৈধ। পরপুরুষের সন্তান অবৈধ। শাসকদল যে-বন্‌ধ উৎপাদন করে তা বৈধ। বিরোধী দল যে-বন্‌ধ উৎপাদন করে তা অবৈধ।"

"অবৈধ নিবারণের উপায়।"

"অ্যাবরশন। তলপেটে কোঁত করে কোঁতকা মেরে খসিয়ে দেওয়া।"

"মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক কবে মধুর হবে?"

"যবে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হবেন।"

"পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না কেন?"

"ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকান। মাথা হল উত্তর ভারত। পা হল দক্ষিণ। পেট হল বিহার। পশ্চিমবঙ্গ হল অ্যাপেনডিক্স। সেখানে চির-অ্যাপেনডিসাইটিস। বাবা-রে, মা-রে অবস্থা।"

"নেতারা কখনওই কেন গরিব হন না?"

"কারণ, তাঁদের টাকা ব্যাগে থাকে না, থাকে জনসাধারণের পকেটে।"

"নেতা হতে হলে কী করতে হবে?"

"প্রথম প্রথম খুব চেল্লাচেল্লি করতে হবে, তার পরে বোবা আর কালা হয়ে যেতে হবে।"

"আমাদের ভবিষ্যৎ কী হবে?"

"ভলিবল খেলা। ওদিক থেকে আসবে, টুক করে পেছন দিকে টপকে দিতে হবে। ভবিষ্যৎ একটা ভাবনা। ভাবলে আছে, না ভাবলে নেই।"

"আমাদের কর্তব্য?"

"বাঁচতে বাঁচতে মরে যাওয়া।"

"বার্তা কী?"

"মরতে ভুলো না—জিন্দাবাদ।"

বেঁচে থাকার বিশ্রী ভয়টা আর নেই

"তুমি কেমন মানুষ?"

"বিশ্বাসযোগ্য নই। কেউ আমাকে বিশ্বাস করলে ঠকবে।"

"বিশ্বাস করে টাকা গচ্ছিত রাখলে মেরে দেবে?"

"না, তা করব না, তবে খরচ করে ফেলব। চাইলে বলব, কয়েক দিন অপেক্ষা করো ভাই। বিপদে পড়ে খরচ করে ফেলেছি। এই ঋণ শোধ হতেও পারে, নাও পারে। অর্থ আর নারী এই দুটো ব্যাপারে এখনও স্বাবলম্বী হতে পারিনি। কিঞ্চিৎ টলমলে আছি।"

"অন্যদিকে?"

"যদি কেউ মনে করে থাকেন বিপদে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াব, তা হলে খুব ভুল করবেন। এই সব ব্যাপারে আমি আমার বউয়ের নির্দেশে চলি। এই পৃথিবীর হিসেব-নিকেশ সে যেমন বোঝে আমি তার কিছুই বুঝি না। ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল। হবেই তো! উকিলের মেয়ে। লোকে বলে, গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি, ওর ব্লাডে ব্লাডে বুদ্ধি।"

"দু-একটা উদাহরণ?"

"যেমন ধরো আমার মায়ের ক্যান্সার হল। মা বলে কথা, আমার গর্ভধারিণী।

বিবেক। ঢালাও চিকিৎসা। বউ বললে, হচ্ছেটা কী? লোককে দেখাতে চাইছ—মাতৃভক্ত ছেলে। তোমার দুটো ছেলে, ছেলের মা না খেয়ে মরুক, সেই ব্যবস্থা করতে চাইছ?"

আমি বললুম, "তার মানে?"

"মানে অতি সহজ। তুমি কত টাকার মালিক?"

"টাকার ভয়ে পেছিয়ে যাব?"

"মায়ের বয়েস কত?"

"সত্তর।"

"আমাদের বড়টার বয়স?"

"সাত।"

'সত্তরকে আরও কয়েক বছর টানার জন্যে সাতটাকে জলে ফেলে দেবে?"

"তা হলে কী করব?"

"হোমিওপ্যাথি। যন্ত্রণা কমাবার ওষুধ আছে। অনেক বছর বেঁচেছেন। যথেষ্ট হয়েছে, আর বাঁচার দরকার নেই। শরীরটা পালটে আসতে দাও।"

"মর‍্যাল সাপোর্ট পাচ্ছি না!"

"পাইয়ে দিচ্ছি। আমার মা আমার বাবার মাকে বৃন্দাবনে ছাড়া করিয়েছিলেন। খুব কায়দা করে। যাও মা, শেষ বয়সে তীর্থ করে এস। যাওয়ার সময় ঠাম্মা আমার মায়ের গাল টিপে আদর করলেন, আহা! এমন বউমা ক'জনের হয় গো!"

"তারপর?"

"ঠাম্মার 'নো ট্রেস'। রটিয়ে দেওয়া হল, তিনি সাধিকা হয়ে গিয়েছেন। সবাই এসে আমার বাবাকে ঢিসঢিস প্রণাম—কত বড় সাধিকার ছেলে আপনি। আমার বাবার বাবা তাঁর মাকে কাশীর বাঙালিটোলার গলিতে বেড়াল ছাড়ার মতো ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন।"

"তা, তুমি তোমার বউয়ের কথা শুনলে?"

"অবশ্যই! সে বললে, এই ইতিহাস মুছে দিতে হবে। যত টাকাই খরচ হোক আমাদের মায়ের চিকিৎসা হবে। নাতি দুটো বড় হবে। তিনি দেখবেন। খাটে শুয়ে গল্প বলবেন। বউমা বলে আমাকে ডাকবেন। মা বলে তুমি কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। গণ্ডায় গণ্ডায় বউ পাওয়া যায়, মা সেই একটা।"

"শেষ পর্যন্ত কী হল?"

"আজ দশ বছর হয়ে গেল, মাকে আমরা টেনে ধরে রেখেছি। এই তো আমরা সবাই মিলে পুরী ঘুরে এলুম। সাগরের আনন্দ নিয়ে ফিরে এলুম।"

"তা হলে প্রথমে অমন সাসপেন্স তৈরি করলে কেন?"

"আমার বউ আমাকে চেনে। আমার চিন্তাটাই আমার দিকে ছুড়ে দিয়েছিল প্রথমে। আমি সাতদিন ধরে ওইরকমই ভাবছিলুম। অনেক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে,

ভুক্তভোগীর সঙ্গে আলোচনা করে খুব আশান্বিত হয়েছিলুম। মৃত্যু অবধারিত। আমাদের ফ্যামিলিও মজার ফ্যামিলি। বড়দা কেরিয়ারে যত রাইজ করতে লাগল, মনের দিক থেকে ততই ছোট হতে লাগল। ঝকঝকে নতুন বাড়ি করে বউকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। বাবার চিকিৎসায় একটি টাকাও ঠেকালে না। শ্রাদ্ধেও এল না। সপরিবারে ইউরোপ ভ্রমণে চলে গেল।"

"তোমার কোনও পরিবর্তন হল?"

"বোধ হয় হল। ভিতরের জট খুলে গেল। মাকে সেবা করতে করতে অন্ধকার ঘরে আলো জ্বলল। আমার জামাইবাবু বড় প্রতিষ্ঠানে বড় পোস্টে ছিলেন। সেটি উঠে গেল। শুরু হল অভাব। ভাগ্নেটা আমাদের কাছে মানুষ হচ্ছে। তিনটে নাতিকে নিয়ে মা এখন মহা খুশি।"

"এখন তোমার কেমন লাগছে?"

"একটা আলো বাতাসঅলা বড় ঘরে ঢুকে পডলে যেমন লাগে সেই রকম লাগছে। ধূপের গন্ধ, আরতির বাদ্য, প্রার্থনার মন্ত্র। বেঁচে থাকার বিশ্রি ভয়টা কেটে গিয়েছে। শুধু মায়ের ক্যান্সার নয় আমার ক্যান্সারও সেরে গেল।"

"আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন। দুয়ার খুলিয়া হে উদারনাথ, রাজসমারোহে এসো।"

মোটর সাইকেল চালিয়ে আসছে একটা লোক, তার মাথাটা নেই

"খুন, খুন, আমাকে খুন করেছে। আমায় খুন করেছে, গুন করেছে।" একজন এইসব বলতে বলতে, ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

সাইকেল মেরামতের দোকানে একজন বসে বসে একমনে টিউবের ফুটো মেরামত করছিল। চমকে উঠল, "অ্যা-খুন।" উঠে দাঁড়াল। রবার সলিউসান, রবারের টুকরো সব পড়ে রইল। বেরিয়ে এল তার চালা থেকে। একটা চিৎকার ছাড়ল, "খু-উ-উ-ন।"

সামনে একটি বস্তি। সেখান থেকে দুদ্দাড় করে বেরিয়ে এল জনা-পঁচিশ লোক। উত্তেজিত 'কোরাস'। "কে খুন, কাকে খুন। লাশ, লাশ কোথায়?"

"লাশটা তো ওই দিকে ছুটতে ছুটতে চলে গেল!"

"আচ্ছা! প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা।"

ওরই মধ্যে একজন একটু সন্দেহ প্রকাশ করলে, "লাশ কী করে ছুটে পালাবে?'

"চুপ কর। আমার মামা নিজের চোখে দেখেছে, মোটর সাইকেল চালিয়ে আসছে একটা লোক, তার মাথাটা নেই। তিন মাইল পেছনে মুণ্ডুটা রাস্তায় গড়াচ্ছে।"

"তার মানে মুণ্ডুটা ঠিকমতো ফিট করা ছিল না। দমকা হাওয়ায় খুলে পড়ে গেছে।"

"তোর মাথা! মুণ্ডু এখানে ফিট হয় না। স্বর্গে একটা কুমোরটুলি আছে। সেইখানে ছাঁচে ফেলে মুণ্ডু তৈরি হয়। ফিট করা হয়। এখানে মুণ্ডু খুলে নেওয়া যায়। লাগানো যায় না।"

"আচ্ছা, ওই বাড়িটায় থেকে থেকে লোক ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। কেন? মনে হয় লাশটা ওইখানে ঢুকেছে। চল তো।"

পঁচিশজন মারমুখী লোক ঠেলে-ঠুলে মিত্তিরবাড়ির দোতলায়। ভোরবেলা মিত্তিরমশাই চা খেতে খেতে হার্ট অ্যাটাকে হঠাৎ মারা গিয়েছেন। তাঁকে সাজানো হয়েছে চির বিদায়ের সাজে। শোকের পরিবেশ। এধারে, ওধারে চাপা কান্নার শব্দ। ফুলে ফুলে দেহ ক্রমে ঢেকে যাচ্ছে।

প্রথমেই ডান্ডা মেরে টেলিভিশনটা ভেঙে দিল।

সবাই হাঁ হয়ে গিয়েছে। বড় ছেলে হতচকিত। জিজ্ঞেস করল, "কী করছেন আপনারা?"

সঙ্গে সঙ্গে পেটে কোঁতকা, মাথায় ডাণ্ডা। সাত-আটটা সেলাইয়ের ব্যবস্থা।

একজন টেলিফোন সেটটা জানলা দিয়ে নিচের রাস্তায় ফেলে দিল। শ্রীমতী মিত্র দু-চোখ ভরা জল নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে বাবা?"

"কী আবার হবে! কাজের লোককে খুন করা হয়েছে?"

"কাজের লোক কোথায়? আমার স্বামী! হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।"

"সে পোস্টমর্টেম হলেই জানা যাবে, হার্ট অ্যাটাক কী, কী অ্যাটাক!"

রান্নাঘরে বিরাট ভাঙচুরের শব্দ। শ্রীমতী মিত্র বললেন, "এই যে ডেথ সার্টিফিকেট!"

"ওসব ফলস!"

বইয়ের আলমারি চুরমার।

পুত্রবধূ বলল, "বাবাকে কেউ খুন করে?"

"সব বাবাকে করে না, কোনও কোনও বাবাকে করে। কালকের কাগজেই আছে। মা, ছেলে আর ছেলের বউ বাবাকে মেরে দেয়ালে গেঁথে দিয়েছিল।"

আর-একজন বললে, "পুলিশ এলে ফুলের তলায় কী আছে বেরিয়ে পড়বে।"

আর-একজন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, "সব শেষ।"

'বাথরুম?"

'কমোড, বেসিন, আয়না?"

"আর জলের পাইপ। সব উপড়ে দে।"

পুলিশ এসে গেল। "কোথায় লাশ?"

"এই যে স্যার! ফুল চাপিয়ে মাল পাচারের তালে ছিল। আমরা আটকে দিয়েছি।"

পুলিশ অফিসার মৃতের মুখ দেখে চমকে উঠে বললেন, "এ কী? ইনি তো আমার অধ্যাপক ছিলেন। সকালের রেডিও খবরে মৃত্যুসংবাদ বলেছে। তোমরা এ কী

করলে।”

“বেশি কী আর করলুম স্যার। এর চেয়ে বেশি করি আমরা। মেয়েদের কাপড় খুলে পেটানো। মাথার চুল কামানো। আসল কাজই তো বাকি!”

পাড়ার পাগলা পঞ্চা এবার ওদিক থেকে এদিকে আসছে গাইতে গাইতে,

“ও দয়াল! বিচার করো,

আমায় গুন করেছে

খুন করেছে

ও বাঁশি।”

সাইকেল দাদা বললে, “ওই ওই। ওই বলছে খুন করেছে।”

“ওরে পাঁঠা! ও খুন আলাদা। শ্রীকৃষ্ণে বাঁশি শ্রীরাধিকাকে খুন করেছিল।”

“ও তাই বুঝি ফাঁসি হয়েছিল। আমি কেত্তনে শুনেছি, এক ব্যাধ তমালের জলে ক্লিন ঝুলিয়ে দিয়েছিল।”

“ঠিক বলেছিস। আর সেই থেকেই এসেছে ঝুলন উৎসব। চল, এবার পঞ্চাকে পেটাই।”

মিশুকে মানুষের ভীষণ অভাব, সব মানুষই কুঁকড়ে গিয়েছেন

সেই সময়ের পাড়া আর এই সময়ের পাড়ায় আকাশ-পাতাল তফাত। মস্ত মস্ত রক ছিল কয়েকটা। লাল চকচকে মেঝে। দুপুরে ছাগল আর কুকুরদের দখলে। বৈশাখের ফেরিঅলাদের বিশ্রামস্থল। ফেরিঅলার জায়গায় এসে গিয়েছেন নানা কোম্পানির সেলসম্যান। সফিসটিকেটেড, রেসপেক্টফুল। চাই ছিটকাপড়, মার্কিন, লংক্লথ,হাতে গজ কাঠি, হেঁকে যান না কোনও ফেলিঅলা। সায়া, সেমিজ, ব্লাউজ, পাজামা, লুঙ্গির গাঁট মাথায় দিয়ে কোনও ফেরিআলা রকে কিছুক্ষণের জন্য শুয়ে থাকেন না। সন্ধের পর রকে জ্ঞানী, গুণী মানুষদের আড্ডা বসত। কত রকমের আলোচনা, হাসি, ঠাট্টা, বাগযুদ্ধ। রক আর নেই। মিশুকে মানুষের ভীষণ অভাব। সব মানুষই কুঁকড়ে গিয়েছেন। পাড়াগুলো সব মরে গিয়েছে। কেউ কারও খবর রাখে না। কে মরল, কে বাঁচল দেখার দরকার নেই। রকে বসে বউদি বলে হাঁক মারার ঠাকুরপো-রা গেলেন কোথায়। আড্ডার সঙ্গে চা চাই, টা চাই।

রকের একটা শিক্ষামূলক দিকও ছিল। রাগী মানুষ, গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষদের এই রকে মেরামত করা হত। দাম্পত্য কলহ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে দেওয়া হত না। ‘চল তো দেখি’—বলে রকের সভ্যরা চড়াও হতেন সেই বাড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে আসত হা-হা হাসির শব্দ। স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন

ঘটিয়ে, লুচি, আলুভাজা, রসগোল্লা খেয়ে সভ্যরা সুখী-সুখী মুখে বেরিয়ে আসতেন।

পুরনো বাড়ির আলাদা একটা আকর্ষণ ছিল। একালের ফ্ল্যাট বাড়িতে যা নেই। গগনেন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, বাড়ির গঠনে একটা রহস্য থাকা চাই। ঘরের মধ্যে ঘর। একটা দুটো চোর-কুঠুরি। কথা শোনা যাচ্ছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সেকালের বাড়ি একটু স্যাঁতস্যাঁতে। চল্লিশ ইঞ্চি দেওয়াল, খিলান। কুলুঙ্গি। শ্যাওলা ধরা উঠোন। কোনও বাড়ি চক মেলানো। দো-মহলা, তিন-মহলা। রাতের দিকে ভূতের ভয়। ভূত আর মানুষের সহাবস্থান।

ভূতদের কাজকর্মে কোনও নতুনত্ব নেই। আমাদের পুরনো বাড়িতে একটা ফক্কড় ভূত ছিল। রাত বারোটার পর শিস দিয়ে ঘুরত। বাবা খুব রেগে গিয়ে ধমক-ধামক দিতেন। শিস দেওয়া এক ধরনের অসভ্যতা।

জ্যাঠামশাই বোঝাতেন, "ভূত কখনও সভ্য হয়। সভ্য হলে ভূত হবে কেন?"

বাবা বলতেন, "এডুকেটেড ভূতও হয়। আমাদের এটা নিকৃষ্ট জাতীয়।"

নিকৃষ্ট ভূতকে জব্দ করার জন্য বাবা সারারাত এস্রাজ বাজাতেন আর জ্যাঠামশাই সারারাত জোরে জোরে শেক্সপিয়র পড়তেন।

পাত্তা না পেয়ে ভূতটা বেড়াল হয়ে গেল, ম্যাও, ম্যাও। গভীর রাতে নগর সংকীর্তনের মতো বেরিয়ে পড়ল অলিন্দ-সংকীর্তন—বেড়ালের ম্যাও, ম্যাও।

বাবা ইংরেজিতে বললেন, "ডান, নাও, আই নিড এ কুকুর।"

জ্যাঠামশাই আরও শুদ্ধ ইংরেজিতে বললেন, "ভূত অফ এ ডগ।"

"নো, নো, ডগ অফ এ ভূত।"

বেশ কিছুক্ষণ এই চলল, ভূত অফ এ ডগ, না না, ডগ অফ এ ভূত। শেষে আশুকাকা ভূত তাড়ালেন, এক চ্যাঙারি গরম খাস্তা কচুরি নিয়ে 'রক সভায়' উপস্থিত হলেন। ভূত পালাল। কিন্তু সমস্যা থেকেই গেল। বাঙালি সমস্যা তৈরির মাস্টার। কে একজন বললেন, "কচুরি অন রক, না রক অন কচুরি।"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল—"জলে পানকৌড়ি, পেটে কচৌরি।"

আমাদের শাস্ত্র বলছে, সমদর্শী হও

চারপাশে যখন খুব ধুমধাড়াক্কা হতে থাকে, এ চেল্লাচ্ছে, ওরা চোর, আমরাই ধোয়া তুলসীপাতা। আমাদের ভোট দাও। আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ তৈরি করব। হিন্দুরা লুঙ্গি পরে মসজিদে গিয়ে আজান দেবে, মুসলমানরাও পট্টবস্ত্র পরে মন্দিরে বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে ঘন্টা বাজিয়ে পঞ্চপ্রদীপে আরতি করবে। হিন্দুরা নিকা করবে, মুসলমানরা টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে।

সব হিসাব কেমন যেন গুলিয়ে যায়। পার্টি-নিরপেক্ষ হতে পারেন না, তাঁরা ধর্ম-নিরপেক্ষ হবেন? যাঁরা স্বজন-নিরপেক্ষ হতে পারেন না, তাঁরা 'আয় ভাই কানাই' বলে রাম, শ্যাম, যদু, মধু সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন! আন্তরিকভাবে? চিরকাল সেইভাবে জড়াজড়ি করে থাকবেন, এ অসম্ভব।

কোনও একটি ধর্ম আগে অভ্যাস করতে হবে। করতে কবতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আসবে। তখন সব কলরব, সব স্বার্থ তলায় পড়ে থাকবে। তখন উপলব্ধিতে আসবে, সবাই এক। ধর্মের পথে না এগোলে, ধর্মনিরপেক্ষতা কথার কথা। অর্থহীন, অন্তঃসারশূন্য একটা স্লোগান। কিছু মানুষের স্বার্থসিদ্ধির কৌশল।

বিভ্রান্তি যত বাড়বে, মানুষ ততই প্রকৃত ধর্মের দিকে এগোবে। সে একটা এলাকা,

সমস্ত ধান্দাবাজি, ধাপ্পাবাজির বাইরে 'সলিড' একটি পাদপীঠ। সব ধর্মেরই এক পথ, সেটি হল স্থিতি। বিশ্বাসে স্নান করে ওঠা। সব হুড়ুম-দুড়ুমের মধ্যে শান্তি ও স্নিগ্ধতাকে খুঁজে পাওয়া।

বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ দেওঘরের তপোবনে রয়েছেন। দু'জন পাদরি এসে বলছেন, "স্বামিজী মেরে ধর্মমে আ যাও।" মহারাজ বললেন, "বাবাঃ আমি তো একলা তোমার ধর্মে যেতে পারব না। সঙ্গে অনেক কিছু যাবে, আমার আচার, বিচার, নিয়ম, সন্ধ্যা-বন্দনা। ধর্ম আমাদের মধ্যে যে সংস্কার তৈরি করেছে, তাকে আমি রাখব কোথায়? তোমার ধর্ম তোমার পক্ষে ভাল, আমার পক্ষে নয়, আবার আমার ধর্ম আমার পক্ষে ভাল, তোমার পক্ষে নয়। প্রত্যেক ধর্মই একটা জীবনধারা তৈরি করে। হিন্দু ধর্মকে উঠতে-বসতে গালাগাল দিয়ে গদি দখলের চেষ্টা না করে, আর একটু উদার হয়ে একটা অহিন্দু রাষ্ট্র করে দিলেই তো সমস্যা মিটে যায়। কেউ যা করেনি। সে একটা কত বড় কাজ হবে। আমরা তো মাত্র কয়েক বছর স্বাধীন হয়েছি। লক্ষ্যভ্রষ্ট ক্ষমতালোভী। কেউ কিছু করেনি গলাবাজি ছাড়া। মানুষের জন্য কিছু করাটাই ধর্ম। সেই কারণেই ক্ষমতার আসবে বসা। এই আসল কাজটি কারও দ্বারা করা সম্ভব হল না এই সাতান্ন বছরে।"

রাজনারায়ণ বসু মস্ত ব্রাহ্ম নেতা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গতম বন্ধু। ডিরোজিওর ছাত্র। একদিন তপোবনে এসেছেন বালানন্দজির সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বলেছেন, "মহারাজ! জাতিভেদ একটা অর্থহীন ব্যাপার। মানুষের তৈরি জাত আমি মানি না, গরু একটা জাত, বেড়াল একটা জাত, বাঁদর একটা জাত, মানুষ একটা জাত। মানুষের আবার তিনটে জাত স্ত্রী, পুরুষ আর ক্লীব। এ ছাড়া আর কোনও জাতিভেদ আমি মানি না।

বালানন্দজি বললেন, "বাবু ইসসেই হামারা মীমাংসা হো যায়েগা। আপনার সঙ্গে আপনার ঘরে মায়ীলোক কেউ আছে?"

রাজনারায়ণ বললেন, "হ্যাঁ বাবা, আমার সঙ্গে আমার মা আছেন, স্ত্রী আছেন, আমার বোন, নাতনি, এঁরা সব আছেন।"

বালানন্দজি হাসতে হাসতে বললেন, "বাবু আপ এতনা জাতি কাঁহাসে বাহার কিয়া? আপনি তো একই স্ত্রী জাতি মানেন, তার মধ্যে এতসব এল কী করে, কন্যা, মাতা, স্ত্রী, ভগ্নী, নাতনি! দেখো বাবু, আপ এক স্ত্রী জাতি করেছিলেন, আপনি তাকে কত ভাগে ভাগ করলেন! আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একরকম ব্যবহার করবেন, মায়ের সঙ্গে আর একরকম, নাতনির সঙ্গে অন্যরকম।"

রাজনারায়ণবাবু চুপ করে রইলেন। শেষে বললেন, "সব স্ত্রীলোককে এক দৃষ্টিতে দেখা ঠিক নয়।"

বালানন্দজি বললেন, "সে-ই বাত। যতক্ষণ পূর্ণজ্ঞান না হচ্ছে, ততদিন জাতিবিচার

থাকবেই। আপনি নিজের ঘরেই এত জাতি নিয়ে বসে আছেন, আর মুখে বলছেন, জাতি বিচার আমি মানি না। একমাত্র পূর্ণ জ্ঞানীর জাতিবিচার চলে যায়।"

রাজনারায়ণবাবু একদম চুপ।

তিনি বাড়ি ফিরে এসে সেই দিনই বাবুর্চিকে ছুটি করে দিয়ে এক ব্রাহ্মণ রাঁধুনিকে নিযুক্ত করলেন। নিজের জাতিতে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিলেন।

বালানন্দজি বলছেন, "আমাদের ধর্ম, আমাদের শাস্ত্র বলছেন, সমদর্শী হও, তার মানে এই নয় সমবর্তী হও। সমদর্শী হো যাও, কিসিকো ঘৃণা মাত্ করো।"

হিন্দুরাই হিন্দুদের গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগাচ্ছে। অন্য ধর্মের মানুষ কিন্তু তা করে না। এইটাই মজা। ধর্মকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা বলছেন ধর্মও বিজ্ঞান, Science of human possibilities.স্বামী বিবেকানন্দের নাম ভদ্রলোকদের স্মরণে হয়তো নেই। তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ ভাবনা এইভাবে করেছিলেন, "আমাদের একটা মন্দির থাকবেই; কারণ হিন্দুজীবন ও দর্শনে ধর্মের স্থান আছে—But we will make a non-sectarian temple, having only "OM" as the symbol of the greates symbol of any sect.

হিন্দুধর্মের সহিষ্ণুতাই এত অত্যাচার সহ্য করার শক্তি দিয়েছে। বাবুরা জানেন কি?

বিয়ে করা বউতেই আজকাল প্রেম থাকে না

"এইবার বলুন, আপনাকে কত টাকা দিতে হবে? আমাদের পরিবার তো দেখলেন। অ্যাডাল্ট তিন জন, দুটো বাচ্চা।"

"দু-বেলা রাঁধতে হবে?"

"হাঁ, দু-বেলা।"

"দেড় হাজার দেবেন। পুজোর সময় এক মাসের মাইনে বোনাস। কাপড় তো দেবেনই, বলার কিছু নেই। শীতের চাদর। রাত্তিরে ভাত না রুটি?"

"দুজনের ভাত, বাকি সবাই রুটি।"

'কখানা রুটি?"

"ধরুন কুড়ি খানা।"

"বাবা, তিন জনে কুড়িখানা!"

"তিন জনে অ্যাভারেজে বারো খানা।"

"বাকি আটখানা?"

"বলছি। ওই যে ছোট মেয়েটা খুচখাচ কাজ করে, ও রাতে আটটার সময় বাড়ি যায়। আটখানা রুটি আর তরকারি ওকে দিতে হয়।"

"তা হলে বড় তিনজন নয়, চারজন। সকালেও তো খাবে?"

"সকালে তো ভাত খাবে।"

"বাঃ, ভাতের হাঁড়ির ওজন তো বেড়ে যাবে। আনাজ বেশি কাটতে হবে। রুটির আটা মেয়েটা মেখে দেবে?"

"না। ও শুধু ফাইফরমাশ। সেই রকমই চুক্তি।"

"লুচি, পরটার বায়নাক্কা আছে নাকি?"

"মাঝে মধ্যে।"

"তা হলে তো ছোলার ডালও আছে। ধোঁকার বাতিক?"

"রেয়ার। মাসে একবার কী দুবার।"

"মোচা, এঁচোড়, থোড়?"

"আছে।"

"বাবা, তেরোস্পর্শ! মাছ চারা না কাটা পোনা?"

"বাচ্চাদের জন্যে কাটা পোনা বাঁধা, পাশাপাশি বাটা, পারসে, পাবদা, ট্যাংরা, মৌরলা, পুঁটি, চিংড়ি, কাজরি।"

"অত খান কেন? সঞ্চয় করুন, সঞ্চয় করুন। গুচ্ছের খাওয়া একটা বদ অভ্যাস। চা কি আমাকে করতে হবে?"

"সকালের চাটা তো করতেই হবে।"

"জলখাবার?"

"সকালের জলখাবার।"

"ফিরিস্তি বেড়েই চলেছে। আত্মীয়-স্বজনদের আসার হিড়িক আছে?"

"তা তো আছেই।"

"মাসে ক'বার?"

"ওই বছরে দুবার, গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি।"

"ক'জন?"

"চার-পাঁচজন। আর মাঝে মাঝে মেয়ে আসতে পারে শ্বশুরবাড়ি থেকে।"

"ক'টা মাথা?"

"বড় মাথা একটা, ছোট মাথা দুটো।"

"তা হলে দু'হাজার।"

"দু'হাজার?"

"শুনুন, সকালে আমি তিন বাড়িতে রাঁধি। ভোর পাঁচটায় যে বাড়িতে ঢুকি, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কাজ করে আর একটা বুড়ি।"

"বুড়ি মানে?"

"বুড়ি মানে ছেলের মা। সে বিশেষ কিছু খায় না, খালি ওষুধ খায়। রান্নার মধ্যে এক তরকারি, ডাল ভাত। ঝপাঝপ দু'বেলার রান্না শেষ করে বেরিয়ে এসেই দ্বিতীয়

বাড়ি। এই বাড়িটা ছেড়ে দেব। ভীষণ খিটখিটে। ছেলের বউটা খাণ্ডারনি। একমাস হল এসেছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে একটা কুকুর এনেছে, আমাকে দেখলেই গ-ড়-ড়, গ-ড়-ড়। বউ বলে কুকুর বুঝতে পারে কার কেমন চরিত্তির। ওই বাড়িটার জায়গায় এই বাড়িটা ঢুকবে।"

"ক'টায় ঢুকবেন?"

"সাতটায়।"

"বেরোবেন ক'টায়?"

"সাড়ে আটটায়।"

"দেড় ঘন্টায় সব হয়ে যাবে?"

"সব আবার কী! এসেই এক ফ্লাস্ক লিকার করে এক পাশে ঠেলে রেখে দেব। যে খায় খাবে। তারপর দুটো গ্যাস চড়া করে জ্বেলে, ঝপাঝপ একটায় ভাত, একটায় ডাল। তারপর ছ্যাঁক-ছোঁক মাছের ঝোল। আউট। বাকি সব ভিরকুটির রান্না নিজেরা করে নেবেন। সারাটা দিন পড়ে আছে।"

"একটুও প্রেম নেই?"

"আমি তো প্রেম করতে আসিনি, রাঁধতে এসেছি। আজকাল বিয়ে করা বউতেই প্রেম থাকে না। স্বামীগুলোও সব মাকাল ফল।"

"এক হাজারে হয় না।"

"তা হলে দু'হাজার পড়ে যাবে।"

"কী রকম?"

"পনেরোদিন আসব, পনেরো দিন আসব না। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।"

মানুষ নিষ্ঠুরতম প্রাণী, মানুষের সমাজ নিষ্ঠুর সমাজ

"কী যে করা যায়?"

"প্রশ্নটা কাকে করলে?"

"যে উত্তর দেবে তাকে।"

"তোমার এই প্রশ্নের উত্তর কেউ দেবে না; কারণ উত্তর জানা নেই। কোনও রকমে বেঁচে বর্তে থাকো যতদিন পার, তার পরে প্যাঁট করে মরে যাও।"

"প্যাঁট বললে কেন?"

"পায়ের চাপে আরশোলা প্যাঁট শব্দ করে মরে।"

"মানুষ কি আরশোলা?"

"মানুষ আর আরশোলা পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাণী। মেরে শেষ করা যায় না। ঝাঁটা, জুতো, লাথি, ইনসেকটিসাইড, পেস্টিসাইড সব ফেল মেরেছে। খেয়ে না খেয়ে হুড়হুড় করে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। ভাগাড়ে থাকতে পারে, রাজপ্রসাদেও থাকতে পারে। কোনও খাদ্যেই অরুচি নেই।"

"আমি আরশোলা নই, অমৃতের পুত্র। আমার ভিতরে তিনি আছেন।"

"তিনি কিনি?"

"পরম শ্রদ্ধেয় ভগবান। মানুষকে অত ছোট করো না। দু-চারটে ছোটলোক থাকতে পারে। সে যেমন গোবিন্দভোগে দু-চারটে কাঁকর।"

"যুগ যুগ ধরে মানুষ অবশ্য। এই রকমই বলে আসছে। মন্দিরে মন্দিরে ভগবান বন্দি। সকাল সন্ধে মন্দিরা বাজিয়ে গান শোনানো হচ্ছে। প্রহরে প্রহরে ভোগ। সেদিন দেখলুম মদনমোহন ভোরবেলা টুথব্রাশ আর টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজছেন।"

সেবককে জিজ্ঞেস করলুম, "ব্যাপারটা কী হল?"

তিনি জানালেন, "মডার্ন মদনমোহন। দিনে দুবার গ্রিন টি খান। শ্রীমতীর সপ্তাহে একবার ফেসিয়াল করা হয়। সেই কবে দ্বাপরে কৃষ্ণের সঙ্গে বৃন্দাবনে নাচতেন, তারপর তো আর নাচেননি। নাচের ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে থাকেন। এখন রোজ ফিজিও থেরাপিস্ট এসে আসন করাচ্ছেন। মদনমোহনের অ্যালার্জি। ওষুধ চলছে। মাঝে মাঝে অম্বল হয়। চুলে ড্যানড্রাফ। অ্যান্টি ড্যানড্রাফ শ্যাম্পু ব্যবহার করেন। সকাল সন্ধে দু'জন টিভি দেখেন নিয়মিত। শীতকালে পিকনিক করেন।"

"এ সবের মানে?"

"দেবতাকে আমরা মানুষ ভাবি। মানুষকে দেবতা ভাবি না। আধুনিক যুগে মানুষকে দেবতা ভাবা অন্যায়, কুসংস্কার। মানুষ হল উন্নত পশু। শিকারি। হয় মারো না হয় মরো।"

"প্রথম এবং শেষ কথা-টাকা। টাকার জন্যে দোকান, টাকার জন্যে দেশ সেবা। টাকার জন্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নার্সিংহোম। ভগবানকেও বেচে দাও। এক রাজা মদনমোহনকে বাঁধা রেখেছিলেন। যুধিষ্ঠিরবাবু দ্রৌপদী দিদিকে পণ রেখে জুয়া খেলেছিলেন।"

"মূর্তি চোরেরা ভাল ভাল প্রাচীন দেবমূর্তি বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে। দেবীর চোখে দামি পাথর বসানো ছিল, খুবলে তুলে নিল। অসহায় অন্ধ দেবতা দেউলে।"

কিচ্ছু করার নেই, কিচ্ছু করা যায় না। মানুষ নিষ্ঠুরতম প্রাণী। মানুষের সমাজ নিষ্ঠুর সমাজ। কে কার উপর কী করে বসবে বলা যায় না। প্রেমের ফাঁদে মেয়ে ধরে বেশ্যালয়ে বেচে দিতে পারে। অবাঞ্ছিত শিশুটিকে ট্রামের আসনের তলায় পরিত্যাগ করে মেতে উঠতেও পারে আবার রমণে। পাপ করলেও কিছু হয় না। পুণ্য করলেও কিছু হয় না। তীর্থযাত্রীর বাসই খাদে পড়ে। অবতারের মৃত্যু ক্যান্সারে। ভগবানের মৃত্যু ব্যাধের বাণে।

ও মশাই, দেশ আবার কী?
বলুন সন্দেশ কড়াপাক, নরমপাক

ঘরে ঘরে একটা করে বাক্স বসানো। তার ভিতরে দিন-রাত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনখারাপি। চুল এলিয়ে কোমর দুলিয়ে বিবসনাদের নাচ। পাশের ঘরে গলা টিপে খুন। তার পাশের ঘরেই আগুন। তার পাশের ঘরে প্রেম। তার পাশের ঘরেই রেপ।

বন থেকে বেরল টিয়ার মতো বাক্স ফুঁড়ে চরিত্ররা সব ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাংলায়। রাত্তির বেলা সব নাচতে নাচতে চলেছে।

"কোথায় চললে বাবাসকল?"

"কাকাবাবু নিদ্রা আসছে না বুঝি? আমরা ডাকাতি করতে যাচ্ছি।"

"তোমরা কোথায় চললে?"

"মেসোমশাই, দু'বোতল টানার পর মেজাজ এসে গেল, যাই, একটা মেয়েকে তুলে কলেজের মাঠে রেপ করে নর্দমায় ফেলে দিয়ে আসি।"

"সে কী?"

"চমকে উঠলেন? ঝালমুড়ি খাওয়ার পর ঠোঙাটা কোথায় ফেলে?"

"টাটা।"

"তোমরা কোথায় চললে?"

"শ্রেণি সংগ্রামে। ওই দোকান বন্ধ করে বেরোবে, গোটাকতক পাম্প করে দোবো।"

"পাম্প মানে?"

'বুলেট পুরে দেবো।"

"মরে যাবে যে।"

"ও অনেক দিন বেঁচেছে, এইবার একটু রেস্ট করুক!"

"তোমরা চললে কোথায়?"

"আজ্ঞে প্রোমোটার শিকার করতে।"

ত্রাসের পরে এসে গিয়েছে সন্ত্রাস। সেটা কী? পাইকিরি দরে মানুষ মারা।

"কেন ভাই?"

"সব শ্মশান কবে দেবো।"

"আপনারা কী করছেন?"

"কেন মাইলের পর মাইল বক্তৃতা। তারপর বন্‌ধ। তারপর বন্‌ধ বন্ধ করার জন্যে এলাহি ব্যবস্থা।"

"তারপর?"

"রাত্তির বেলা ওই বাক্সে ঢুকে বন্‌ধ অসফল করার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা বন্‌ধ করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

"আপনারা কারা?"

"কেন? কেন? আমরা শাসন করি।"

"আর, আমরা শাসনের বিরোধিতা করি।"

"রেজাল্ট?"

"গলাবাজি ভার্সাস গলাবাজি। মার আর মারি। মারামারি।"

"দেশ?"

"ও বাবা! সেকেলে বুড়োটা সেন্টিমেন্টের কথা বলছে। ও মশাই, দেশ আবার কী? বলুন, সন্দেশ—কড়াপাক, নরমপাক, কাঁচাগোল্লা, মাখা।"

জ্যোতিষীদের পরীক্ষা করতে গেলে
শেয়ালেও কামড়ে দিতে পারে।

"খুব খারাপ। কেলেঙ্কারি রকমের বাজে কোষ্ঠী। সব ক'টা গ্রহ ড্যামেজড লেখাপড়ার আশা ছেড়েই দিন। নো চান্স। এখন কথা হল—ক'দিন বাইরে থাকবে যাবজ্জীবন হয়ে যাবে। প্রেমিকাকে গলা টিপে খুন করবে। ঘটনাটা মাসখানেকে মধ্যেই ঘটবে।"

"এখন কথাটা কী হল জানেন, এই কোষ্ঠীটা যার, সে এখন আমেরিকায়।"

"ব্রিলিয়ান্ট স্কলার, পি-এইচ.ডি, করছে।"

"করবেই তো। আমি তো আগেই দেখে নিয়েছি।"

"তা হলে ও-সব কী বললেন একটু আগে?"

"শুনুন, আমি গোলা জ্যোতিষী নই। তন্ত্রসাধক। প্রতি অমাবস্যায় শ্মশান করি শ্মশানের শ্মশান তারাপীঠে। মাঝরাতে মা এসে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেন মহাদেব টুকি টুকি করেন। আপনাকে দেখেই বুঝেছি, আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছেন। তান্ত্রিক জ্যোতিষীদের নিয়ে এ-সব করবেন না। বিপদে পড়ে যাবেন

হয় ওলাওঠা হবে, না হয় ধনুষ্টঙ্কার। শেয়ালেও কামড়ে দিতে পারে।"

"শেয়াল আসবে কোথা থেকে?"

"আমি পাঠিয়ে দোবো।"

"তা হলে শুনুন, এই কোষ্ঠীটা যার, সে কিন্তু এখনও জন্মায়নি। আমি যেখানে যা পেরেছি, যা মনে এসেছে, একটা করে গ্রহ বসিয়ে গিয়েছি।"

"বেশ করেছেন, আমাদের কাছে কোষ্ঠীটাই সব, কার কোষ্ঠী আমরা জানতে চাই না। গ্রহই সব, মানুষ কিচ্ছু নয়। মানুষ হল ঘোড়া, গ্রহ হল সওয়ারি।

যে দিকে চালাবে সেই দিকেই চলতে হবে। অসহায় মানুষ।"

টেলিভিশনের এক-এক খোপে এক-এক জ্যোতিষী। বিচিত্র সাজ। কেউ গ্রহাচার্য, কেউ গ্রহসম্রাট, কেউ গ্রহরাজ। শরীর থেকে গ্রহ ঠিকরে ঠিকরে বেরোচ্ছে। অনলাইন জ্যোতিষী। টেবিলের উপর যন্ত্র। থেকে থেকে পিঁক পিঁক। "হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। ষষ্ঠে মঙ্গল। একাদশে শনি, রাহু। বুধটা কোথায়?"

"সেইজন্যেই তো ফোন, রবি কোথায়? তিন বছর হয়ে গেল। নিরুদ্দেশ। সে বেঁচে আছে, না মরে গিয়েছে?"

"ধুর মশাই! ছকের রবি কোথায় আছে?"

"আটে আছে।"

"হুঁ! ড্যামেজড্। নিচস্থ। একটা রবি চড়াতে হবে। রবিটাকে একটু পাওয়ার দিতে পারলেই ছকটা ঝলসে উঠবে। এখন বলুন, কী জানতে চাইছেন?"

"রবি কোথায়?"

"রবি কে?"

"আমার জামাই। মেয়েটাকে বিয়ে করেই পালিয়েছে।"

"এই ছকটা কার?"

"আমার।"

"শ্বশুরের ছক দেখে জামাই কোথায় বলা যায়? জামাইয়ের ছকটা আনুন।"

"কোথায় পাব?"

"যেখান থেকে জামাই পেয়েছিলেন, সেখানেই পাবেন।"

"সে তো মেয়ে ধরেছিল। প্রেমের বিয়ে।"

"বিয়ের পর যেখানে গিয়ে উঠেছিল, সেইখানে খোঁজ করুন।"

"সেখানে প্রোমোটার। পুরনো আর কিছুই নেই। নতুন ঢালাই হচ্ছে।"

"মেয়ের আবার বিয়ে দিন।"

"কী করে দেব। মেয়ে তো একলা নয় ভবিষ্যৎ আসছে।"

"বরণ করুন, নিজের অন্তিম স্মরণ করুন।"

পিঠে চেঙ্গিস খান চাপলেও ঘোড়া চিরকালই মূর্খ

এ কোনও দলাদলি, রাগারাগির কথা নয়। বলা যেতে পারে সত্যদর্শন। যা দেখা যাচ্ছে, যেমন দেখা যাচ্ছে। সেটা কী? পুরুষরা সব ঘোড়া আর স্ত্রীরা সব জকি। এই ঘোড়ারা বয়েস অনুসারে, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, জরদগব ইত্যাদি। আর সেই অনুসারেই 'ম্যাচিংজকি'। ঘোড়ারও বয়েস বাড়ে, পিঠে চেপে থাকা জকিরও বাড়তে থাকে।

সব যুবতীকেই একটি ঘোড়া কিনে দেওয়ার রীতি এই সংসারে প্রচলিত। সেকালে আস্তাবলে যেতেন অভিভাবক, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ইত্যাদি মুরুব্বি। ঘোড়া পছন্দ করতেন। দরদাম চলত! প্রেডিগ্রি দেখা হত, অ্যারেবিয়ান না অস্ট্রেলিয়ান! না একেবারেই দিশি টাট্টু। একালে এ দেশে বিদেশি রীতি এসে গিয়েছে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। সেটি হল প্রেমের যুগ।

কীরকম প্রেম? মদের জগতে একটা পানীয় আছে—নাম তার ড্রাই জিন।

ধোলাইয়ের জগতে একটা ধরন আছে—ড্রাইওয়াশ। সেইরকম ড্রাই প্রেম। অনেকটা নাট-বল্টুর মতো। অনেকটা ভূতের মতো—নেই কিন্তু আছে।

এই প্রেমের যুগে—টপাটপ সব ঘোড়ার পিঠে চেপে বসছে। ঘোড়ারা চিরকালই মূর্খ টাইপের। পিঠে চেঙ্গিস খানই চাপুন কি শ্রীচৈতন্যই, দৌড়তে শুরু করল। প্রথমজন নিয়ে যাবেন যুদ্ধে, দ্বিতীয়জন মহামানব প্রেমিক, নিয়ে যাবেন সংকীর্তনে। ফলে একালের ঘোড়াও বছরখানেক প্রেমের লাগামে বাঁধা পড়ে, পার্ক, পার্ক স্ট্রিটে ঘোরাঘুরির পর টোপর মাথায় দিয়ে ভাড়া করা বিয়ে বাড়ির ছাতে উঠবে। ক্যাটারারদের কেরদানি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মীয়-স্বজনদের গুলতানি। বাইরে আলো দিয়ে লেখা—বুম্বা ওয়েডস টুম্পা। বিপরীতটাই লেখা উচিত ছিল—টুম্বা ওয়েডস বুম্বা।

বাঙালিদের মধ্যে আজকাল এই চলটা খুব হয়েছে—ভাল নাম একটা থাকলেও বিদঘুটে ডাক নামে ডাকাটা 'স্মার্টনেস'। হাই সারকেলে এইটাই এখন রেওয়াজ। কলকাতার এক বিদেশি নৈশ ক্লাবে হৃষ্টপুষ্ট জনৈক বিজনেস ম্যাগনেট এক খতম যৌবনা কসমেটিক সুন্দরীকে জিজ্ঞেস করছেন, "হাই মোচা, ব্যারেল আসেনি এখনও।" মোচার পেশাকি নাম মৃদুলা। আর তার স্বামীর নাম মহাদেব। নারকেলডাঙার সামান্য অবস্থা থেকে বিত্তে আরোহণ। এখন বসবাস কলকাতার 'পশ' এলাকায়। ক্লোজ সারকেলে এই নামেই সম্মান। যিনি জিজ্ঞেস করলেন স্কুলে বন্ধুমহলে পাঁচু নামেই পরিচিত ছিলেন। এলেমের জোরে বিরাট হয়েছেন। এখানকার বন্ধুমহলে তাঁর নাম, প্রপেলার।

কাজি নজরুলের নাতির ছেলের বয়সী একজন পাবলিক ফাংশানে গান গাইতে বসে রেলা নিচ্ছেন, "কাজিদা বললে গানের এই জায়গাটা একটু লেফট সাইডে মুচড়ে দাও। পঞ্চম বললে, গোলাপে একটা গুঁতো মারো। শচীনকত্তা বললেন, চাঁদ শব্দের চাঁটা নাম দিয়ে বাইরে করো।"

একেই বলে ঘোড়া-কালচার। জকিরা পেটের দু'পাশে গোড়ালির গুঁতো মেরে ছোটাচ্ছে। কোথায় প্রেম। জীবনের স্বাদ এখন চিরেতার জলের মতো। ছেলেমেয়েদের অবস্থা শোচনীয়। একটা নম্বর কম পেলেই আত্মহত্যা। লেখাপড়ার কোনও দাম নেই, কিন্তু অনেক দাম দিয়েই কিনতে হবে।

তা হলে এটা কোন যুগ? সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর, কলি। এই যুগের নাম—দিশেহারা। ছুটছে ঘোড়া চোখে ঠুলি বাঁধা। যাচ্ছে কোথায়? নো হোয়ার। বিজ্ঞানীদের মহাচিন্তা-শকুনিরা গেল কোথায়? বিলুপ্তির পথে! কী আশ্চর্য, শকুনিরা মানুষ হবে না। তাই তো এই ভালচার কালচার!

'ভালচার কালচার' অথবা 'ভালগার কালচার'। ঘরে ঘরে বসানো আছে 'হর্টিকালচার ব্লক'। আশিটা চ্যানেলে জীবনদর্শন। মোটামুটি এইরকম প্রশ্নোত্তর :

"সিরিয়াল কাকে বলে?"
"বাজনা বাজিয়ে মেয়েদের ঝগড়াকে।"
"সংসার কাকে বলে?"
"বউকে বাগ মানানোর ব্যর্থ চেষ্টাকে।"
"শিশুরা কী করে?"
"পাকা পাকা কথা বলে আর কেবল খায়, চিপস, লজেনস, পানীয়, আইসক্রিম।"
"মেয়েরা কী করে?"
"চুলে শ্যাম্পু, শরীরে সাবান।"
"বাজার আর রাঁধুনি ছাড়া রান্না কোথায় হয়?"
"টিভিতে।"
"কে খায়?"
"কেউ খায় না। দেখে।"
"ভারতীয় ক্রিকেট টিম কোথায় ভাল খেলে?"
"বিজ্ঞাপনে।"
"শ্রেষ্ঠ কর্তব্য কী?"
"প্রেম করা।"
"সঙ্গীত কাকে বলে?"
"হাতে মাইক, হাঁটুতে আর্থারাইটিস, একটা সেটে পা মেপে মেপে ঘোরাঘুরি।"
"ঈশ্বর কে?"
"সেল ফোন।"

অনাহারে ও অপুষ্টিতে মৃত্যু, তফাতটা কী

আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও তো, অনাহারে মৃত্যু আর অপুষ্টিতে মৃত্যুর মধ্যে তফাত কী?"

"অনাহারে থাকলে সাত দিনের মৃত্যু! অর্ধাহারে তিন-চার বছর ধুকধুক। আর ঘাস-পাতা কচুরিপানা খেয়ে থাকলে কঙ্কালসার একটা অস্তিত্ব। নিজেকে খেয়ে যতদিন বেঁচে থাকা যায়।"

"পুষ্টি কাকে বলে?"

"সুষম আহার। ব্যালেনসড ডায়াট। প্রোটিন, ক্যালোরি, ভিটামিন, মিনার‍্যালস-এনার্জি, স্ট্রেংথ। টগবগে একটা মানুষ। সেই মানুষটার মধ্যে ঘোড়া থাকবে, বাঘ থাকবে, সিংহ থাকবে, সামান্য পরিমাণে শেয়াল থাকবে।"

"হাতি?"

'"না, হাতি মোটা। রোগা হাতি থাকতে পারে।"

"রোগা হাতি মানে ছুঁচো?"

"দ্যাটস রাইট। তরকারিতে সামান্য হিং দিলে স্বাদ বাড়ে। সেইরকম সামান্য ছুঁচো থাকলে চরিত্রে একটা মজা আসে। উপকারী মানুষের চেয়ে ক্ষতিকারক মানুষের খাতির বেশি। এটা স্বীকার করো তো। সেদিন পাড়ার মুদির দোকানে আমাদের মাস্টারমশাই অন্তত বিশবার বললেন, বাবা আমাকে এক প্যাকেট হলুদ দাও। কেউ শুনছেই না। এমন সময় একটা সাইকেল রিকশা এল। পিছনে বাঁ দিকে কাত মেরে বসে আছে আমাদের পাড়ার বিখাত মস্তান ঠোঁটকাটা রাজু। বাঁ হাতটা বাড়িয়ে জড়ানো গলায় একবার শুধু বললে,

"অ্যায়, একটা দেশলাই।"

"লাফিয়ে উঠল দোকানের মালিক, 'ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার'। তিন দিক থেকে তিনজন অ্যাসিস্টেন্ট পড়ি-কী-মরি করে দৌড়ে এল তিন প্যাকেট দেশলাই নিয়ে। রাজু যাওয়ার সময় মহাবাক্য উচ্চারণ করল, "রেডি রেখ, রাত্তিরে এসে নিয়ে যাবে।" মুদি মোহিত হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। যেন ভাব এসে গিয়েছে।"

"কী রেডি রাখবে?"

"কী আবার, মাসকাবারি তোলা। দেবতার পূজা। এদিকে রিয়াল স্যার তখনও বলে চলেছেন, ভাই, এক প্যাকেট হলুদ, হলুদ এক প্যাকেট ভাই।" কেউ শুনছেই না। তা হলে শিক্ষাটা কী হল? চরিত্র তৈরি করতে হয়। ভাল মানুষ। উপোস করে মরো। জন্তু-জানোয়াররা উপোস করে? অপুষ্টিতে মরে? নেভার। স্লোগানটা ভুলে গেলে? দিবারাত্র কানের কাছে হেঁকে যাচ্ছে—লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই। স্লোগানের এমন এফেক্ট, আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লাথি ছুঁড়ি, আমার বউ প্রায় দিনই খাট থেকে ধপাস। এতকাল যে বেঁচে আছি, সে তো আমার বউয়ের সঙ্গে লড়াই করে।"

"আমি কোথায় একটা গ্রিক প্রবাদ পড়েছিলুম, Marriage is the only evil that men pray for.

"শোনো, লড়াই বাড়িতে, লড়াই অফিসে, লড়াই পার্টিতে। লড়াই সর্বত্র।"

"পার্টির নাম করছ? বলেছি না পার্টির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলবে না।"

"আরে ধুর, এ পার্টি সে পার্টি নয়। মদের পার্টি, ককটেল পার্টি।"

"তা হলেও। আমার পিসেমশাইয়ের নাম ছিল হরি। আমার পিসিমা স্বামীর নাম নিত না। খঞ্জনি বাজিয়ে মহানাম করতেন ফরে কৃষ্ণ, ফরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ফরে ফরে।"

মেয়েদের পায়ের তলায় পুরুষ-পাপোশ

'মা! হয় শান্তি দাও, না হয় দড়ি দাও।"

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে ঠ্যাং করে ঝোলা ঘণ্টাটা একবার বাজালেন।

"কী হল আশু? কী চাইলে? অত জোরে ঘণ্টা?"

"মায়ের পিলে চমকে দিলুম।"

"কারণ?"

"অনেকদিন বেদিতে বসে আছেন, জিভ বের করে, মালা পরে, কোনও কাজ করছেন না। খালি সেবা নিচ্ছেন। প্রণামীর বাক্স টাইট। একটা টাকা ঠেলে ঠুলে ঢোকাতে গেলুম। ঢুকল না। আজ আমার জন্মদিন।"

"জন্মদিনে মাকে এক টাকা প্রণামী? একটাকা আজকাল ভিখিরিরাও ছুড়ে ফেলে দেয়।"

"মা তো রিফিউজ করেননি। করেছে কাঠের বাক্স। মা আমার অবস্থা জানেন। মায়ের উচিত রোজ খবরের কাগজ পড়া।"

"মা তো আর নিজে পড়বেন না, তুমিই একটা সময় করে রোজ এসে পড়ে শুনিও।"

"ভাবছি তাই করব। ওই একঘেয়ে চণ্ডী, গীতা, ভাগবত শুনলে দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারবেন না। কমিউনিকেশন গ্যাপ হচ্ছে, সেই কারণেই চারিদিকে এত অনাচার, অবিচার। রোজ সকালে ময়ের চা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরই মায়ের মূর্তির পিছন দিকে বসে জোরে জোরে সংবাদপত্র পাঠ করব। আমারও পড়া হবে, মায়েরও শোনা হবে।"

"কী কাগজ পড়বে? বাংলা না ইংরাজি।"

"মা কালী বাঙালি, তাঁকে বাংলা কাগজই শোনাব।"

"কোন কাগজ? বাজারি কাগজ না পার্টির কাগজ?"

"যে কাগজের সার্কুলেশন সবচেয়ে বেশি, সেই কাগজ।"

"সম্পাদকীয় পড়বে?"

"না, তা হলে মা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যাবেন। স্রেফ টাটকা নিউজ।"

"স্পোর্টস পেজ!"

"স্পোর্টস মানেই তো ক্রিকেট। ও শুনিয়ে লাভ নেই। যদি কোনওদিন খেলতে পারে—ভারত জিতবে।"

"না, অস্ট্রেলিয়াকে যদি একটু উইক করে দেওয়া যায়।"

ক্রিজে ব্যাট হাতে থর থর করে কাঁপছে। আমাদের বোলাররা কাঁপতে কাঁপতে এলোমেলো বল ছুড়ছে, তাতেই সব আউট হয়ে তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছে।"

"শোনো, তোমার মালকড়ি অনেক আছে, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, হাই টি, ডিনার। ব্যাট-বল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ। আমার ছেলেটা পাস করে বসে আছে, নো চাকরি। এক পকেট প্রেমপত্র। শেষে ডেসপ্যারেট হয়ে একটাকে যদি 'রেজিস্ট্রি' করে ফেলে, তা হলে আমার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ?"

"তুমি পরিষ্কার বলে দাও, 'ফার্স্ট চাকরি দেন বিয়ে'। এখন প্রেমের ওপর নিজেকে ফেলে রাখুক।"

"সে-কথা বলার মুখ নেই আমার,আমি 'ব্যাচেলার' হলে বলতে পারতুম। নিজে বিয়ে করে অন্যকে কেমন করে বলি, তুমি বিয়ে কোরো না।"

"তুমি বিয়ে না করলে তোমার ছেলেও হত না, বলার প্রয়োজনও হত না।"

"অ্যায়! ঠিক বলেছ। বিয়ের একটা মস্ত 'ডিফেক্ট'—এই 'ইস্যু'। দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার। মজাটা কী বল তো? 'এক' থেকে জগৎ শুরু,' দুই' থেকে সংসার।"

"একালে প্রেমটা খুব বেড়ে গেছে। ম্যালেরিয়ার মতো। কেঁপে কেঁপে আসছে। ভটভটিয়ে আসছে।"

"ভটভটিয়ে আসছে মানে?"

"প্রেম হল মোটর সাইকেল। সামনে একটা ছেলে, ভুঁড়ি আঁকড়ে পেছনে শালোয়ার কামিজ পরা একটা মেয়ে। ভটভটিয়ে প্রেম চলছে। কিছুদিন পরেই

দু'জনের মাঝখানে আর একজন; যেন দু' 'পিস' রুটির মাঝখানে মাখন। পুরোটাই হল গিয়ে তোমার 'ব্যালেনসিং গেম'। একটু এদিক-ওদিক হলেই ছিটকে চিৎপাত।"

"তা হলে বুঝলে, সংসারের অপর নাম চিৎপাত।"

"ওই তো, মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ। সংসার চিত্র। শিব চিৎপাত, বুকের ওপর নৃত্য করছেন সংসার খাঁড়া দিয়ে কাটছেন, চুলের মুঠি ধরে 'হ্যান্ড ব্যাগের' মতো পুরুষের মুণ্ডু ঝুলিয়ে রেখেছেন। মায়ের পক্ষপাতিত্বটা একবার দ্যাখো! পুরুষ বিদ্বেষী। হাতের মুণ্ডুটা স্ত্রীলোকের হলে ধরতে সুবিধে হত। বড় বড় চুল পেয়ে যেতেন। মা যে! মেয়েদের মারবেন না। মেয়েদের পায়ের তলায় পুরুষ-পাপোশ।"

চাকার তলায় স্বামী মরে,
নাচো-নাচো হরে হরে

আমি একটা ইডিয়েট। ক্রিস্ট্যালাইজড ইডিয়েট।

কেন?

আমি আগে ভাবতুম বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, বিছে, কুমির, কামট, হাঙর, এই সবই ভয়ের। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। পাল্লায় পড়লে আর রক্ষা নাই। হয় কড়মড়িয়ে না হয় ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে শেষ করে দেবে।

অবশ্যই।

না, এখন আমি যা দেখছি, তা হল, মানুষ। মানুষ হল সবচেয়ে বিপজ্জনক জন্তু। অসাধারণ একটি কথা মানুষ সম্পর্কে—Man is at thc bottom An animal, midway a citizen, And at the top divinc. But the climate of this world is such that few ripen at the top. তলার দিকটা জন্তু, মাঝখানটা নাগরিক আর মাথার দিকটা দেবময়। কিন্তু সমস্যা হল পৃথিবীর এই জলবায়ু এমনই, খুব অল্পসংখ্যক মানুষেরই ওপর দিকটা পাকে। জন্তু নাগরিক হতে পারে দেবতা পারে না। এই হল মানুষের নিয়তি। অ্যারিস্টটল আরও মজার কথা বললেন, Man, when perfected, is the best of animals, but when seperated from law

and justice, he is the warst of all. পরিস্রুত, পরিশীলিত মানুষ শ্রেষ্ঠ জন্তু, কিন্তু যে মানুষ আইনের ধারে ধারে না, যার বিচার বোধ নেই, সেই মানুষ হল নিকৃষ্টতম পশু।

সে আর কী করা যাবে? সাজগোজ পরা পশু হয়েই থাকতে হবে। আমাকে বোকা বানিয়েছে ধর্ম। মানুষ অমৃতের পুত্র। জীবই শিব। আর চামড়ার খোলে ভগবানের পুর ভরা আছে। মানবজনম শ্রেষ্ঠ জনম। দুর্লভ একটা ব্যাপার। লক্ষ কোটি যোনি পেরিয়ে আসতে হয়েছে। এমন মানব জনম আর পাবে না।

প্রসূতী যন্ত্রণায় চিৎকার করছেন। ডাক্তাররূপী ভগবান মহাবীর রূপান্তরিত হয়ে এক থাপ্পড়ে তাঁর ইয়ার ড্রাম ফাটিয়ে দিলেন। বসাও তদন্ত কমিশান। ভগবানরা সমবেত। ভগবানরা বিচার করে রায় দিলেন, কোনও কারণে এই ভগবানটি অতিশয় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তাই আর এক ভগবানের কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়েছেন।

বাসের স্টিয়ারিং হুইলে ভগবান। রাস্তায় ট্রাফিক সিগন্যালে অপেক্ষা করছে মোটর সাইকেল। আরোহী এক দম্পতি। সন্তানটিকে পাঠশালায় পৌঁছে দিয়ে ফিরছেন। হুইল ভগবান বৈকুণ্ঠের রথের দৌড়ে মত্ত ছিলেন। আরোহী সমেত দ্বিচক্র যানটিকে মড়মড়িয়ে চলে গেলেন। সময়ের একটু এদিক আর একটু ওদিক। দু'টি শিশু অনাথ হয়ে গেল। ভরসা জগতের জগন্নাথ।

এমন কতই হয়। যার হয় তার হয়। তোমার তো হয়নি!

যদি হয়!

তখন ঝেড়েঝুড়ে বের করে আনো 'ভাগ্য-থিওরি'। ওই যে 'সোফোক্লেস' বলছেন, Fate has terrible power/you cannot escape it by wealth or war/No fort will keep it out, no ships outrun it. ভাগ্যের প্রচণ্ড শক্তি। ‍র্থ আর সামর্থ দিয়ে ভাগ্যকে পরাস্ত করা যায় না। কোনও দুর্গই তার কাছে দুর্ভেদ্য ‍য়। সমুদ্রে এমন কোনও জাহাজ নেই যা ভাগ্যকে মেরে বেরিয়ে যেতে পারে। ‍খন ধরবে তখন ধরবে।

তরতাজা সুন্দর ডাক্তারবাবু রবিবার সকালে পরিবারের মধুর ছায়া থেকে বেরিয়ে ‍সে মৃত্যুর ছায়ায় তলিয়ে গেলেন। ধীবররা নদীর জালে খুঁজে পেলেন তাঁর ব্যাগ। ‍ক মেরেছে, কেন মেরেছে? পরিবার তো ভেসে গেল! কাগজে খবর হল। ছবি ‍াপা হল। সময় চলে গেল। আরও সব ঘটনা ঘটে এই ঘটনার স্মৃতিকে ম্লান করে ‍দবে। কয়েকটি বিষণ্ণ মুখ এই জগতের উদাসীনতায় ঘুরে বেড়াবে আরও কিছুকাল।

এখানে ভগবান আর শয়তানের 'পার্সেন্টেজ' কী—কতটা? ভগবান আর ‍য়তানের পরিমাণ! For the world. I count it not an inn, but an hospital; ‍nd a place not to live but to die in. টমাস ব্রাউন লিখলেন 'রিলিজিও মডিচি'-তে। পান্থশালা নয়, হাসপাতাল। বাঁচতে আসিনি মারতে এসেছি।

বন্ধু এসে বন্ধুকে ডেকে নিয়ে গেল। আলুভাতের সঙ্গে কড়া ডোজে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাইয়ে দেওয়া হল। বন্ধুর বাড়িতে বন্ধুর মধ্যাহ্নভোজ। তারপর কাটারি দিয়ে কেটে দূরে কোনও জলায় ফেলে দিয়ে আসা হল। এই হল একটা তরতাজা তরুণের বাঁচতে আসার পরিণতি।

কত মন্দির! মঙ্গল আরতি! সংকীর্তন, প্রবচন। দীক্ষার লাইন। নদী, পর্বত, তীর্থস্থান। মহামানবদের আগমন, নির্গমন। নামী-দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টাকাবাজির লেখাপড়া। ইওরোপ, আমেরিকা।

বউ পুড়ল কেরোসিনে
ডাকাত পড়ল বৃদ্ধার ঘরে।
চাকার তলায় স্বামী মরে
নাচো নাচো হরে-হরে।।

দেশ উচ্ছন্নে গেল, আপনি কী করতে পারেন

'দেশটা কি সত্যিই এতটা খারাপ হয়ে গেল?"

'এই রে, পাগল আজ সাত সকালেই বেরিয়ে পড়েছে। খবরের কাগজ পড়ার কুফল। এন আর এস-এর ক্যান্টিনে যা হচ্ছে হোক না। জুনিয়র ডাক্তারদের মেরে রক্তারক্তি করে দিয়েছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিটা দেখার দরকার কী, ল্যাংড়া আম খাচ্ছ খাও না। তপসে মাছ জামাইষষ্ঠী করে গেছে। মহরত হয়ে গেছে। দু-চারটে ফ্রাই শ্বশুরমশাইরা এখন টেস্ট করে দেখতে পারেন। বেশ মুচমুচে। এক রাউন্ড বৃষ্টি হয়ে গেলেই চোঁ চোঁ করে ইলিশ এসে গঙ্গায় ঢুকবে। ট্যাকের পাওয়ার থাকলে খাবেন। তা না থাকলে এফ এম-এ আলোচনা শুনবেন। মনে রাখতে হবে, বাঙালিরা ইন্টেলেকচুয়াল জাত। সভা, সমিতি,সেমিনার, ডিবেট, সোনার গয়না, নেল পালিশ, মাস্ক, বিউটি পার্লার, শ্যাম্পু।"

"দাদা। দেশটা কি সত্যিই গেঁজে গেল?"

"জানি না।"

"এই যে অন্ধকার ময়দানে মেয়েটাকে খুন করল।"

'যে-মেয়ে একটা পুরুষের সঙ্গে রাত দশটায় ময়দানে যায় তার সেফটি সম্পর্কে আমাদের বলার কিছু নেই।"

"তা হলে এই যে লোকটি, যাকে সবাই মিলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেললে বললে, হাপিস হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মানুষ হারিয়ে যায়। তারপরে একটা পোড় কঙ্কাল, পরিবার-পরিজনের হাতে দিয়ে বললে, যান পুড়িয়ে দিন। যেটুকু বাকি আছে কমপ্লিট করে দিন।"

"রং পলিটিকস করলে ওইরকমই হবে। মনে নেই ঔরঙ্গজেব ভাইয়ের মাথা কেটে খানা টেবিলে সোনার থালায় সাজিয়ে রেখেছিল? নিজের বুড়ো বাবাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল? সিংহাসন হল সিংহের আসন। সেই আসনে ছাগল বসে ব্যা-ব্যা করে পাবলিকই তো হাসবে। রাজত্বের প্রেসটিজ চলে যাবে। রাজনীতি হল সাপ নিয়ে খেলা। হিম্মত থাকা চাই।"

"গুজরাত?"

"আজ্ঞে না। বাঙালিকে মারা অ্যালাউড। মশা, মাছি মারলে জেল হয়?"

"না। যদি তোমাকে মেরে ফেলে?"

"মারবে না। আমি কোড মেনে, ট্র্যাফিক মেনে জীবন পথে চলি। দু'হাত তোলা আছে। দেশের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমি আমারটা বুঝি। এর বাইরে আমা কিছু বোঝার দরকার নেই। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, রোজগার। ব্যস। মিটে গেল মামলা

"তোমার মেয়ের ওপর যদি অত্যাচার হয়?"

হবেই না। কারণ আমার মেয়ে নেই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মেয়ে আসার পথ ব করে দিয়েছি। একটা ছেলে বাঙ্গালোরে মানুষ হচ্ছে। মেয়েদের উপর অত্যাচার হবে না তো কার উপর হবে?"

"গলাবাজি করে কোনও লাভ নেই। লজ্জার ব্যাপার চেপে রাখতে হয়। পাঁ কান করতে নেই।"

"তা হলে, ওই যে দুই মাস্টার। হেড মাস্টার কেটলি মেরে অ্যাসিস্ট্যান্ট হে মাস্টারের মাথা ফাটিয়ে দিলেন।"

"তাতে আপনার কী? আপনার কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে? নিজেকে নিয়ে থাকতে শিখুন। অয়েল ইওর ওন মেশিন।"

"দাদা! দেশটা তা হলে সত্যিই উচ্ছন্নে গেল?"

"যদি গিয়েই থাকে আপনি কী করতে পারেন? বাড়ি যান। পাখার তলায় বসু বাইরে তাকাবেন না। নিজের ভিতরটা দেখুন। গান করুন—ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যাও/বাটা ভরা পান দেব, বসে বসে খাও।"

আজ যে 'ব্লু', কাল তারা 'হোয়াইট'

নুষের বয়স বাড়লে ছেলেবেলার কথা খুব মনে পড়ে। সেই স্কুল! সেই আমার লের বন্ধুরা। শিক্ষকমশাইরা। একটা অন্য জগৎ। পড়া আর পরীক্ষা ছাড়া আর গনও উদ্বেগে নেই, সংসারের ব্যাপার সংসারে। সে বুঝবেন বড়রা। নতুন, নতুন ই,খাতা, পেনসিল, কলম সব যেন পুজোর আয়োজন। সেকালের শিক্ষকমশাইরা তিটি ছাত্রকে নামে চিনতেন। সে থাকে কোথায়! বাড়িতে কে কে আছেন! সব বর রাখতেন তাঁরা। কে মন দিয়ে পড়ে, কে অমনোযোগী তাও জানতেন। সে লের শিক্ষকমশাইদের মনে হতো ঋষি। কী সব ত্যাগ! কত টাকাই বা মাইনে তেন।

বিকেলে স্কুলের মাঠে ফুটবল পড়ত। আমাদের গেম টিচার প্রকাশ স্যার ফুরর রে বাঁশি বাজানো মাত্রই দুদ্দাড় করে মাঠে নেমে পড়তাম। স্যার, দুটো দল তৈরি রে দিতেন। একটা দলের নাম 'ব্লু স্টার', আর একটার নাম 'হোয়াইট স্টার'। য়াইট স্টারকে ব্লু-স্টার কোনও দিনই হারাতে পারত না। তার কারণ হোয়াইট

স্টারে স্টার ছিল সুব্রত। ইচ্ছে করলে সুব্রত বড় ফুটবলার হতে পারত। সে এখন বিলেতে। সায়েনটিস্ট।

ব্লুস্টারের দুঃখ দেখে স্যার একটা কৌশল বের করেছিলেন। রোজই নাম পালটাতেন। আজ যে ব্লু, কাল তারা হোয়াইট। এই আইডিয়াটা এল কোথা থেকে: স্যার বললেন, একটা ঘোড়দৌড় হচ্ছে। দুটো ঘোড়া ছুটবে। যে লাস্ট হবে সে-ই ফার্স্ট প্রাইজ পাবে। এখন দৌড়টা হবে কীভাবে। ঘোড়াদুটো কিন্তু যেমন দৌড়য় ঠিক সেই রকমই দৌড়বে।

আমাদের দ্বারা এই ধাঁধার সমাধান সম্ভব হয়নি।

স্যার বললেন, "ভেরি সিমপল। চেঞ্জ দি জকি। এ ওর ঘোড়ায় চাপবে, ও এর ঘোড়ায়। তখন যে ঘোড়া জিতবে সেই ঘোড়াই হারবে।"

সেই ইংরেজ আমলের বাড়ি। প্রথম যেদিন স্কুলে গেলাম বেশ ভয় ভয় করছিল বিরাট গেট। গেটের মাথায় লোহার আর্চে ঢালাই করা স্কুলের নাম। ঢোকার মুখে ডানদিকের পিলারে বড় একটা পোস্ট বক্স। পোস্টাপিস তৈরি করে দিয়েছে। স্থানীয় মানুষ ওই ডাকবাক্সেই চিঠি ফেলবেন। বিয়াল্লিশের স্বদেশি আন্দোলনের সময় স্বদেশিরা ওই পোস্টবক্সটা ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে এদিকে আবার মেরামত করা হয়।

গেট থেকে পথ চলে গিয়েছে বাঁ দিকে। ডানদিকে উঠে গিয়েছে লম্বা লম্বা সাত আটটা সিঁড়ি। পাথর বাঁধানো। বাঁ দিকের দেওয়ালটা শ্বেত পাথরের। সেই পাথরে খোদাই করা রয়েছে প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের নাম। তাঁরা সব বড় বড় মানুষ। আমাকে স্কুলে ভর্তি করাতে এসে আমার দাদু এই মার্বেল ফলকটির সামনে দাঁড় করিয়ে বলেছিলেন, "এইখানে নাম তুলতে হবে। মনে থাকে যেন, আমি আকাশ থেকে দেখব।"

বিশাল বিশাল দুটো হলঘর। তার মধ্যে একটার নাম নিউ হল। সেই হলের দেওয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, স্বামী বিবেকানন্দ। সুন্দর একটা লাইব্রেরি। দোতলায় হেডমাস্টারমশাই আর অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টারমশাইয়ের ঘর। পশ্চিমে খেলার মাঠ। বড় বড় দুটো শিশুগাছ। তার পরেই গঙ্গা।

ডিসেম্বরের শীতে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হত। তখন স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন নামকরা এক ব্যারিস্টার। স্কুলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এক প্রখ্যাত জমিদার। ব্যারিস্টার সাহেব দেড়ঘণ্টা ধরে 'অ্যানুয়াল রিপোর্ট' পড়তেন। আমরা ছাত্ররা অধৈর্য হয়ে পড়তুম। বড়রা বলতেন, কেউ যদি ওই রিপোর্টটা চিলের মতো ওঁর হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে নিতে পারত তো বেশ হত।

সবশেষে হত আমাদের নাটক। পরিচালনায় আমাদের পণ্ডিতমশশই। মজার

মানুষ ছিলেন। সংস্কৃতের ক্লাসে বললেন, হাফ প্যান্ট পরে সংস্কৃত শেখা যায় না। নাটক যেমনই হোক যুদ্ধ থাকা চাই। পণ্ডিতমশাই সেইভাবেই লিখতেন। সেবারের পালার বিষয় ছিল, সীতা উদ্ধার। ইন্দ্রনীল, রাম, আমি লক্ষ্মণ, বিকাশ হনুমান। তার পিছনে বিশাল এক খড়ের ল্যাজ। ইংরেজির স্যার কেবল সাবধান করছেন। মাইন্ড ইওর টেল।

পালা খুব জমেছে। হনুমান প্রয়োজনের অধিক লম্ফঝম্ফ করছে। রাম আর লক্ষ্মণ সমুদ্রের ধারে। সেতুবন্ধন হলেই লঙ্কায় প্রবেশ। এক রাউন্ড যুদ্ধ। সীতা উদ্ধার। আমি লক্ষ্মণ। পাঠ ভুলে গিয়েছি। ভুলে গেলেও বিষয় মনে আছে। নিজেই রচনা করে গড়গড় বলে যাচ্ছি, কবিতার ছন্দে। প্রম্পটার যতীন স্যার চশমাটা একবার নাকের ডগায় নামাচ্ছেন আর তুলছেন, শেষে খেপে গিয়ে বললেন, "হনুমানটার কান ধরে স্টেজের বাইরে বের করে দে।" রামচন্দ্র এই নির্দেশ অক্ষর অক্ষরে পালন করল। রাম হনুমানের কান ধরেছে, আমি তার বৃহৎ খড়ের লোজটি দু'হাতে সাবধানে ধরে পিছনে পিছনে চলেছি, খসে না যায়! ফটাফট হাততালি। আমাদের প্রেসিডেন্ট জমিদারমশাই বলছেন, "হনুমান ইজ অলওয়েজ এ হনুমান। রাইটলি সার্ভ্‌ড। কান টেনে ছিঁড়ে দে।"

মেয়েটা যদি প্রেম করে বেয়াড়া ছেলের সঙ্গে

এ রকম প্রায়ই বলতে শোনা যায়, "আর বোলো না ভাই, চিন্তায়-চিন্তায় শরীর আধখানা হয়ে গেল।"

"কীসের চিন্তা?"

"এই মেয়েটা বড় হয়েছে। তার ওপর দেখতে-শুনতে ভেরি অ্যাট্রাকটিভ। কলেজে যায়, পড়তে যায়। যতক্ষণ না বাড়ি ফেরে ভীষণ দুশ্চিন্তা।"

'তারপর?"

"ছেলেটার কী হবে। একটা কেরিয়ার তৈরি করার খরচ লাখ-লাখ টাকা। কোথায় পাব?"

"তারপর?"

"স্ত্রীর শরীর। রোজ সন্ধের দিকে মাথা ধরছে। ব্রেন ক্যানসার হল কি না কে জানে।"

"তারপর?"

"আমার কোম্পানি কলকাতা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে বাঙ্গালোরে পালাবার মতলব করছে।"

"তারপর?"

"বাড়িতে সর্বক্ষণের জন্য একটি কাজের মেয়ে আছে, যদি গলায় দড়ি দেয়।"

"তারপর?"

"আমার ভগিনীপতির এখন-তখন অবস্থা। বোনটা যদি ঘাড়ে এসে পড়ে!"

"তারপর?'

"কোম্পানি যদি পাততাড়ি গোটায় তা হলে কী হবে। সব মিলিয়ে সংসার চালাবার মিনিমাম খরচ বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা।"

"তারপর?"

"আমার বুকের বাঁ দিকে প্রায়ই একটা ব্যথা হয়। হঠাৎ যদি মরে যাই!"

"তারপর?"

"একজন বললে, আমার মেয়ে রোজ টেলিফোন বুথ থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে। কার সঙ্গে কথা বলে?"

"তারপর?"

"আমার ছেলেটা বন্ধুর মোটরসাইকেলের পেছনে প্রায়ই চাপে। যদি অ্যাকসিডেন্ট হয়!"

"তারপর?"

"আমার বউ ইমারসান হিটার দিয়ে জল গরম করে, যদি শক লাগে!"

"তারপর?"

"ফ্ল্যাটে থাকি। যদি ডাকাত পড়ে!"

"তারপর?"

"তারপর ধরো মেয়েটা যদি প্রেম করে বেয়াড়া একটা ছেলেকে বিয়ে করে, তারপর সেই ছেলেটার প্রেমের হ্যাবিট যদি না যায়। আবার যদি প্রেম করে। আমার মেয়েটাকে যদি আত্মহত্যায় উস্কানি দেয়। অথবা ধরো বিয়ের পর চাপ সৃষ্টি করে, তোমার বাবার কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা আনো, আমি ফ্ল্যাট কিনব। কোথায় পাব পাঁচ লাখ। এরপর ধর শুরু হল নির্যাতন। তারপর গ্যাস লিক করিয়ে পুড়িয়ে দিল।"

"তারপর?"

"ধরো ছেলেটাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল। মুক্তিপণ পঞ্চাশ লক্ষ।"

"তারপর?"

"এরপর ধরো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেল, র‍্যাগিং-এর ঠেলায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ফিরে এল।"

"তারপর?"

"এমন মেয়েকে বিয়ে করলে, বাড়িতে ঢুকেই বললে, এ দুটো কে? আভি নিকালো।"

"তারপর?"

"ছেলে পাল্লায় পড়ে মদ ধরলে। মদ খেতে খেতে সিরোসিস অফ লিভার হয়ে গেল।"

"তারপর?"

"টাটা সুমোয় চেপে সপরিবারে দিঘায় যাচ্ছিল, একটা লরি মুখোমুখি মেরে দিলে।"

"তারপর?"

"গলদা চিংড়ি খেয়ে হোল ফ্যামিলির আন্ত্রিক।"

"তারপর।"

"আমার নাতি বসে বসে পড়ছে, হঠাৎ পাখাটা মাথায় পড়ল।"

"এই নাও।"

"কী এটা?"

"রাত্তিরে মায়ের নাম নিয়ে কোঁত করে গিলে ফেল; আগামিকালের সকাল আর দেখতে হবে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফুরফুরে ছাই।"

"ভাই মৃত্যুকে আমি ঘৃণা করি। আমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা কী জানো! যদি সেরিব্রাল হয়, মরলুম না, পড়ে রইলুম বিছানায় বছরের পর বছর।"

বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারদ ঋষি ভগবান বিষ্ণুকে বললেন, আরামে শুয়ে আছেন এদিকে শনি মহারাজ আপনার দিকে এগিয়ে আসছেন, বারোটা বছর নাজেহাল করে ছাড়বেন। ভগবান বিষ্ণু বললেন, একটা উপায় ভেবেছি, বারো বছর আমি পাথর হয়ে বসে থাকব।

তাই হল। বারো বছর পাথর আবার বিষ্ণুমূর্তি ধারণ করলেন। ডাকলেন শনি মহারাজকে।

"পারলে কিছু করতে?"

শনি হাসলেন, "আমার কাজ আমি করে দিয়েছি প্রভু। আমি ধরার আগেই আপনি ভয়ে পাথর হয়েছেন। আমার কালকে আপনি নির্দিষ্ট করেছেন নিজেই। পাথর হওয়ার মতিভ্রমটা আমিই ঘটিয়েছি প্রভু। আপনি ধরতে পারেননি।"

"তা হলে?"

মহাপুরুষ বলছেন, "ভবিষ্যৎটাকে সামনে থাকতে দাও, পিছনে টেনে এনো না।"

এতকাল ছিল মার্কসিস্ট, ক্যাপিটালিস্ট, এখন শুধুই কেরিয়ারিস্ট

আত্মীয়-স্বজনরা এক আজব জীব। আমিও সেই দলেই। আমিও তো অনেকের আত্মীয়। কী রকম আজব জীব। খবর এল আমার এক আত্মীয় ভীষণ অসুস্থ। সাতদিন ধরে জল্পনা চলল, একবার দেখতে যাওয়া উচিত। না যাওয়াটা অমানবিকতা। মানুষের বিপদে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত। একে বলে মানবিকতা। পারমাণবিকতা ভাল নয়। আজ তুমি সুস্থ, কাল তুমি অসুস্থ হতে পার। অসুস্থ মানুষ সঙ্গ চায়, সঙ্গী চায়।

তবে আজ যাওয়া যাক। না, আজ কী করে যাব? আজ তো ক্রিকেট। তবে কাল। কাল, কাল। না কাল হবে না। কাল নেমন্তন্ন। পরের দিন? অসম্ভব। গান শুনতে যাব। বেশ, তারপরের দিন? 'প্রবলেম' আছে। সোমার বার্থ ডে।

অবশেষে একদিন, পাড়ার মিষ্টির দোকান থেকে তিরিশ টাকার সন্দেশ কিনলুম। প্রথমে এইরকম ভেবেছিলুম, একশো টাকার কিনব। বেশ বড়সড় একটা বাক্স। আমার গৌরব বাড়বে। বারবার তো নয়, এই একবার। হিসেবি মন বললে, বাড়াবাড়ি করো না। সংসারি মানুষ। তা হলে পঞ্চাশ। আর একটু কমাও, কেউ মনে রাখবে না। তা হলে তিরিশ।

সন্দেশের 'কোয়ালিটি' খুব খারাপ। একের চার ছানা, তিনের চার ময়দা। সে

যাই হোক। আমি তো আর খাচ্ছি না। আমার মনে সামান্যতম দুঃখ নেই, মুখটাকে যতদূর সম্ভব করুণ করে অসুস্থ মানুষটিকে জিজ্ঞেস করলুম, "কেমন আছ ভাই?" উত্তরের অপেক্ষা না করেই গলগল, "ভাল ডাক্তারকে দিয়ে ভাল-ও-ও করে চিকিৎসা করাও, ঠিক হয়ে যাবে। আজকাল মেডিসিনে 'ট্রিমেন্ডাস' প্রগরেস হয়েছে। কেবল অসুখ, অসুখ চিন্তা করবে না। বেস্ট ডক্টর ইজ ইওর মাইন্ড। রবার্ট অ্যাটকিনস বলছেন, নাইনটি পার্সেন্ট অফ দি ডিজিসেস আর সাইকোসোম্যাটিক। দশবার বলো, আমি সুস্থ, আমি সুস্থ, আমি সুস্থ। খুব ভাল টাটকা সন্দেশ এনেছি। যখন দিলে একেবারে গরম। খাবে। না খেলে শরীর সারবে কী করে! সব রকম একটু একটু খেতে হবে। ফ্রুটস খাবে। খুব বেশি বেশি খাবে। আজকাল নিউট্রিশনিস্টরা ফ্রুট্স খাওয়ার কথা খুব বলছেন। সিজন্যাল ফ্রুট্স। শশা খাবে, পেঁপে খাবে, শাঁকালু খাবে, কলা, আপেল।"

এতক্ষণে রোগীর ক্ষীণ-কণ্ঠ শোনা গেল, "কী খাব? গলায় তো ক্যানসার। কিছুই তো যাচ্ছে না!"

"ক্যানসার? ক্যানসার তো কী হয়েছে! মনের জোর বাড়াও। জোর করে খাও। ক্যানসারের ভাল, ভাল ওষুধ বেরিয়েছে। কেমো হচ্ছে?"

"কী করে হবে, বিশাল খরচ। আমার অবস্থা তো জানো!"

খরচের কথা এসে গিয়েছে। আর বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। উপদেশ যত খুশি দেওয়া যায়। রক্তদান শিবিরে এক বোতল রক্ত দেওয়া যায়। টাকা হল জীবন। জীবন কি দেওয়া যায়! তোমার অসুখ তোমার অসুখ। আমার অসুখ আমার অসুখ। হিজ হিজ, হুজ হুজ। "আমি তা হলে আজ আসি ভাই। আবার আসব। বড় চিন্তায় থাকব। কেমন রইলে না রইলে! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব।"

"কোনও লাভ নেই ভাই। স্বয়ং ভগবান, শ্রীরামকৃষ্ণ ক্যানসারে চলে গেলেন।"

"আরে সে তো ভগবানের লীলা! রোগযন্ত্রণা কী করে সহ্য করতে হয় সাধারণ মানুষকে শিখিয়ে গেলেন। অতবড় একটা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভারতবর্ষের পপুলেশান হাফ হয়ে গেল, রাজা-মহারাজারা সব ছেতরে ছত্রাকার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণর শরীরে এতটুক একটা আঁচড়ও লাগল না। শেষে ছোট্ট একটা পেরেক ফুটল পায়ে। টিটেনাস হল। ভগবান ফিরে গেলেন ভগবানের আলয়ে। তখন 'এ টি এস' আবিষ্কার হয়নি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কালে কেমো, রেডিয়েশন আবিষ্কার হলে ঠাকুরকেও এত তাড়াতাড়ি আমরা যেতে দিতুম!"

"পরিবার, পরিজন পথে বসার আগেই আমি যেন যেতে পারি ভাই।" সঙ্গে সঙ্গে নিজের অভিনয়প্রতিভা টেনে বের করলুম। মুখে বেদনা, চোখে করুণা, শরীরে ঝাঁকুনি—"এসব কথা আর যাকে বলতে হয় বোলো, আমাকে বোলো না। তুমি আমার আগে চলে গেলে আমি কীভাবে থাকব! আমাদের ছোটবেলার সেই

দিনগুলো ভুলে গেলে?"

চোখ যেখানে ফেল করে নাক সেখানে সার্ভিস দেয়। কয়েকবার ফোঁস ফোঁস করলুম। সাপ হিংসায় ফোঁস ফোঁস করে। মানুষ ফোঁস ফোঁস করে নকল দুঃখে। বাঘ, ভাল্লুক, হাতি গণ্ডার সব বোঝা যায়। হাতি হয় পায়ে পিষবে, না হয় শুঁড়ে পেঁচিয়ে তুলে আছাড় মারবে। বাঘ খ্যাঁক করে ঘাড়ে কামড়ে ধরে কয়েকবার ঝটকা মারবে। তারপর সজনে ডাঁটার মতো আয়েস করে চিবোতে থাকবে। গণ্ডার এসে নাকের খাঁড়া দিয়ে ফেঁড়ে ফেলবে। মানুষ কী করবে বলা শক্ত।

নান্টু হাপুসহুপুস প্রেম করে নন্দিতাকে বিয়ে করল। প্রেম উবে গেল। প্রেমিকা বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে দাড়ি ওপড়াতে লাগল। নন্দিতার আর এক প্রেমিক উইংসের পাশ থেকে বেরিয়ে এল। শুরু হল টাকডুমাডুমডুম। ফ্রয়েড জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে খুব আক্ষেপ করে লিখলেন বহু চেষ্টা করেও বুঝতে পারলুম না, মেয়েরা কী চায়। What women want. আমি বলব, আজও বোঝা গেল না, মানুষ কী চায়!

আমরা এতকাল শুনে এসেছি, সোসালিস্ট, মার্কসিস্ট, ক্যাপিট্যালিস্ট ইত্যাদি। এখন পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে কেরিয়ারিস্টরা। বৃদ্ধা আশ্রয় নিয়েছেন বৃদ্ধনিবাসে। দামি নিবাস। এক সময় নামকরা কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। দুই ছেলে বিদেশে বড় ডাক্তার। মেয়ে বড়লোকের বউ। বৃদ্ধার খবর কেউ রাখেন না। রাখার দরকার কী? না বেশ আছেন। অভাব তো নেই। বুকে সর্দি জমল। ভীষণ শ্বাসকষ্ট। তালিকাভুক্ত ডাক্তার এসে দেখলেন। বললেন, "এনি টাইম এনি মোমেন্ট।" কেউ আসবেন না। ছেলেও না, মেয়েও না। বলাই আছে, শেষ হলেই, ছাই করে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবেন। কে একজন সহানুভূতি প্রকাশ করে বলতে গিয়েছিলেন, "আহা! এই সময় ছেলেরা যদি কাছে থাকতেন!" বৃদ্ধা অক্সিজেনের মাস্ক সরিয়ে খাবি খেতে খেতে বললেন, "চুপ করুন। আমার জন্য তারা কেরিয়ার নষ্ট করবে!" এই তাঁর শেষ কথা।

ভদ্রলোক বললেন, "আহা, এমন না হলে অমন ছেলে হয়!" পরে জানা গেল, ভদ্রমহিলার স্বামীর গামক্যানসার হয়েছিল। অপারেশন হল। বাঁচলেন না। ডেডবডি নার্সিংহোম থেকে বাড়িতে আনতে দিলেন না। ইংরিজিতে বললেন, "হি লুকস আগলি।"

মানুষ নাকি বানর হয়ে গিয়েছে, কে তাদের গুরু

বাঁদর সাম্রাজ্যের দলপতি দুটি বাঁদরকে শহরে পাঠালেন, 'দেখে আয় তো, মানুষ নাকি আমাদের চেয়ে বেশি বাঁদর হয়ে গিয়েছে। কে তাদের গুরু? তিন মাসের মধ্যে আমি একটা রিপোর্ট চাই। বারাণসী, বৃন্দাবন, অযোধ্যা থেকে আমাদের ভাইয়েরা মাথা হেঁটে করে, ল্যাজ গুটিয়ে চলে আসছে। হোয়াই?"

দুই বাঁদর লাফাতে লাফাতে শহরে চলে এল। বিরাট শহর। চওড়া চওড়া রাস্তা। বিশাল বিশাল বাড়ি। প্যাঁ-পোঁ গাড়ির পর গাড়ি। চতুর্দিকে ফুট কড়াইয়ের মতো মানুষ। শব্দ, ধোঁয়া। সব বাঁদরকেই এরকম দেখতে, তাই দলপতি দু'জনকে চেনার জন্য একজনের ল্যাজ কেটে ছোট করে দিয়েছেন। তার ফলে, একজনের নাম 'ফুল টেল', আর একজনের নাম 'হাফ টেল'। ডাক নাম হল, 'ফুলু' আর 'হাপু'।

দু'জনে বিরাট একটা বাড়ির কার্নিসে বসে আছে। ফুলু বললে, "হাপু, খাওয়া-দাওয়ার কী হবে রে! সবই তো ইট, কাঠ, পাথর! ফল, মূল, কলা কিছুই তো নেই।"

"ভেবেছিলুম, এত বড় একটা ছাদ, বড়ি-টড়ি দিয়ে রাখবে, গপাগপ খাব। জলের ট্যাঙ্ক আর লোহার পাইপ ছাড়া কিছুই নেই।"

"প্যান্ট পরা বউরা বড়ি দেয় না। চল, কোথাও মন্দির আছে কি না দেখি। আমাদের ভরসা ভক্ত আর ভগবান।"

মন্দির মানে বিরাট মন্দির। কী কারুকার্য! মার্বেল পাথরে মোড়া। বন্দুকধারীরা মন্দিরটাকে ঘিরে রেখেছে। ভক্তরা ভয়ে ভয়ে গুটি গুটি ঢুকেছে। তাদের হাত খালি। একজন পুজো সাজিয়ে এনেছিল। একজন প্রহরী কেড়ে নিলে। খুব কাজিয়া হচ্ছে। ফুলু আর হাপু কথা কাটাকাটি থেকে যেটুকু বুঝল, টেররিস্টরা যে কোনও সময় 'ভক্ত-বোমা' পাঠাতে পারে। কোটি টাকা দামের মন্দির ধ্বংস হয়ে যাবে।

ভক্তদের জন্য একটা কাউন্টার হয়েছে। সেখানে একশো, পাঁচশো, হাজার যা পারো জমা দাও। একটা পেতলের চাকতি ধরিয়ে দেবে। তারপর জামা-কাপড় ধরে টানাটানি। মেটাল ডিটেক্টরের বিপ বিপ। তারপর একটা হলে ঢোকো দরজায় দরজায় বন্দুকধারী। সামনে একটা স্ক্রিন। সেই স্ক্রিনে ফুটে উঠবে দেবতার মূর্তি। ভজন হচ্ছে। প্রেম লাগাও, ভক্তি লাগাও, জ্ঞান দে দে ভগোয়ান।

হাপু বললে, "ফুলু, এ কী রে ভাই! সব ভগবানের ছায়া দেখে বাড়ি ফিরছে।"

"আরে ভাই ভগবানকে কে কবে দেখেছে। ভগবান তো ছায়াই। বল, ছায়ার ছায়া দেখে বাড়ি ফিরছে। আমাদের পূর্বপুরুষ রামচন্দ্রজির সঙ্গে বসে কলা খেয়েছে। আমাদের বরাতে কলাও নেই, রামও নেই।"

"চল তা হলে নদীর ধারে যাই। ঠাণ্ডা পানি খাই।"

নদীর ধারে যেতেই একটা লোক খুব খাতির করলে। এক ছড়া কলা দেখালে। সেই কলার লোভে এগোতেই দু'জনে জালে পড়ে গেল। জাল থেকে খাঁচায়। তারপর দেখলে তারা জাহাজে চেপেছে। শুনলে জাহাজ যাচ্ছে আমেরিকায়।

হাপু বললে, "আহা! বাবা বেঁচে থাকলে কত খুশি হত। ছেলে আমেরিকায় যাচ্ছে।"

ফুলু বললে, "কেন যাচ্ছি বলতো! আমরা তো ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার নই।"

আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে দু'জনকে বিশাল একটা খাঁচা-ঘরে রাখা হল। একজন বললেন, "দুটোকে ডজন, ডজন মেক্সিক্যান কলা খাওয়া। ভারতের বাঁদর তো, আমেরিকার সাইজে আনতে হবে।" সাতদিনের মধ্যেই ফুলু আর হাপু বেশ মোটাসোটা হয়ে গেল। একজন দর্জি এসে মাপ নিয়ে গেল। তিনদিনের দিন প্যান্ট, কোট, টাই, টুপি চশমা পরে দু'জনে পাক্কা সাহেব। ফুলু হাপুকে বললে, "তোকে ঠিক প্রফেসরের মতো দেখাচ্ছে।"

হাপু বললে, "তুই যেন ইংরিজি সিনেমার হিরো! কী ভাগ্য আমাদের! দেশের বাঁদরগুলো আর মানুষ হল না! কে এক সাহেব বলেছিল বাঁদর থেকে মানুষ হয়।"

"কিস্যু জানে না। আমাদের দেশের পণ্ডিতরাই ঠিক। তাঁরা বললেন, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না।"

"গাধাদের জন্য আমার ভীষণ দুঃখ হয় রে। এত বছর হয়ে গেল কিছুতেই খাড়া হয়ে দাঁড়াতে শিখলে না। মুখটা দেখেছিস, একেবারে বোকা গাধার মতো। আর

গলার স্বর! ওই গলায় ইংরিজি গানও হবে না।"

"ইন্ডিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল—ধ্রুপদ, ধামার। গলায় বেশ জোয়াড়ি আছে।"

"সে থাক না। সুর নেই, স্কেল নেই। গাধাদের নিয়ে মহাসমস্যা। ইন্ডিয়ান গাধা যদি আমেরিকায় আসে, সেই একই গাধা। তফাত এই ইন্ডিয়ায় জুটত ইন্ডিয়ান লাথি, আমেরিকায় এলে আমেরিকান লাথি। খাওয়া ফিরবে বরাত ফিরবে না।"

কথা থেমে গেল। কোথা থেকে দু'টো সাহেব এল অনেক যন্ত্রপাতি নিয়ে। দু'জনের মাথা ফুটো করে বোতামের মতো দুটো বস্তু ঢুকিয়ে দিল। মাথায় ফিট করে দিল দুটো টুপি।

কোমরে বেঁধে দিল চওড়া বেল্ট। তারপর পরিয়ে দিল কোট-প্যান্ট। চোখে বেঁধে দিল চশমা। একজন বললে, "ডিভাইসটা চেক করো।"

আর একজন কী করলে, দু'জনে নাচতে লাগল। আবার কী করলে, দু'জনে খাঁচার লোহা বেয়ে উঠতে লাগল। আর একটা কী করলে, দু'জনে শুয়ে পড়ল। পরীক্ষক বললে, "ব্রেন আন্ডার কন্ট্রোল। লেট্স গো।'

একজন সন্দেহ প্রকাশ করলে, "ব্রেন কন্ট্রোল করলেই হবে? মাইন্ডের কী হবে?'

"ব্রেনের কন্ট্রোলে মাইন্ড। মাইন্ডে একটা চিপস ঢুকিয়ে দিয়েছি। এইবার কমান্ড ওরা হয়ে গিয়েছে মাঙ্কি কমান্ডার।"

"অপারেশন স্টার্টস।"

হাপু আর ফুলু দু'জনে দুটো দেড়শোতলা বাড়ির ছাদে গিয়ে উঠেছে। লাল টুপিতে লেখা 'এমাজেন্সি সার্ভিস'। ব্যস্ত সময়। গাড়ি, মানুষ সব ছুটেছে। ফুলুর চোখের সামনে হাপু দ্রাম্ করে ফেটে গেল। বিপুল বিস্ফোরণ। ধাপে ধাপে সব ভেঙে ভেঙে পড়ছে। মিডিয়া প্রচার করছে—বাঁদর বোমা এক্সপ্লোড্স।

মেয়েদের সৌন্দর্যের এইটটি পার্সেন্ট পায়ে

"এই তো, শরীর ঠিক আছে?"

"খারাপ হওয়ার তো কোনও কারণ নেই।"

"সে কী, কাল রাতে ওই অখাদ্য খাওয়ার পর তুমি সুস্থ আছ? ওটা ফিশ রোল, না ডেডবডি রোল, স্যালাডের বদলে এক চিমটে ব্লিচিং পাউডার দিলেই হত। যাক, কেপ্লনের ছেলের বিয়েতে যা হওয়ার তাই হয়েছে। রতনের পুত্রবধূটিকে কেমন দেখলে?"

"এক নজরে যা দেখলুম, বেশ সুন্দরী। এ পাড়ায় ওরকম সুন্দরী বোধ হয় নেই।"

"সুন্দরী বলতে তুমি কী বোঝো!"

"চোখা নাক, টানা টানা চোখ, চাঁদের মতো মুখ, ছিপছিপে গড়ন, বেঁটেও নয় লম্বাও নয়, দুধে আলতা রঙ।"

"এই দেখলে? পায়ের দিকে তাকিয়েছিলে?"

'পায়ের দিকে তাকাতে যাব কোন দুঃখে, আমার কি জুতোর ব্যবসা!"

"মেয়েদের সৌন্দর্যের এইটটি পার্সেন্ট পায়ে। পা বলে দেবে লক্ষ্মী হবে না অলক্ষ্মী। পা দিয়েই বিচার হবে বিধবা হবে, না সধবা থাকবে। দজ্জাল হবে, না বাধ্য

হবে।”

'“আমি মশাই মুখটা সামনে ছিল, সেইটাই দেখেছি পায়ে পড়িনি, মানে পা পড়িনি। আপনি কীভাবে দেখলেন?’

“আমি পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে উঠলুম।”

“কী পেলেন?”

“ভবিষ্যৎ পেয়ে গেলুম। বাইশ শো বাইশ খড়ম পা, ছ্যাতরানো বুড়ো আঙুল।’

“কী হবে!”

“সংসার জ্বালিয়ে দেবে, বিধবা হবে, কুলটাও হয়ে যেতে পারে।”

“যদি চব্বিশ ঘণ্টা মোজা পরিয়ে রাখে!”

“তাতে কী হবে, তাতে কী হবে!” মোজার ভেতর পা-টা তো রয়েই গেল।”

“যদি অ্যামপুট করিয়ে দেয়।”

“তুমি সিরিয়াসলি নিচ্ছ না। দেখলে না, রতনের ছেলেটা এই আটল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কী রকম ভেড়া হয়ে গেছে! আর নেমন্তন্ন করেছিস, ঘরের বাইরে আয়, তা না খামের গায়ে ডাকটিকিটের মতো সেঁটেই রইল। আজকালকার ছেলেগুলো সব ভেড়ুয়া, নিন কম্ পুপ্। কণ্ঠস্বর শুনলেন?”

“না। আমি শাড়িটা ধরালুম, সোজা ছাতে। ঝপাঝপ খেয়ে, বাড়ি, বিছানা। হ্যাঁ, ডব্‌ল অ্যান্টাসিড।”

“আহা কী গলা, যেন কচি কাক।”

“পিনপিনে, প্যানপ্যানে গলার চেয়ে ওইরকম একটু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গলা অনেক ভাল। ইলা অরুণের গান শোনেননি?”

“আমি ভাই আখতারি বাঈয়ের ভক্ত, কোয়েলিয়া বলে যেখানে হাঁক মেরেছেন, মনে হচ্ছে সব কোকিল সাইলেন্ট। সে সব গলার আলাদা দাপট, আলাদা জোয়াড়ি। আর একটু বড় হয়ে মাসতিনেক পরে এ যখন রতনকে বাবা বলে ডাকবে, মনে হবে তারে বসে দাঁড়কাক ডাকছে। আরে ছ্যা,কোথা থেকে পয়সা খরচ করে একটা মেয়ে হাবিলদার ধরে নিয়ে এল। এ পাড়ায় আর একটি অমন আছে।”

“কে?’

“আমাদের শোভনের বউ। সেদিন দোতলার বারান্দা থেকে রাস্তায় দাঁড়ানো শোভনকে বলছে, অ্যায় শুনছ, ধনেপাতা আনতে ভুলো না। আমার হাত থেকে দুধের ক্যান পড়ে গেল। তিনি আবার সব সময় ম্যাক্‌সি পরে থাকেন। এয়ারি। দেখলে মনে হবে, বাতাস লাগা পালের মাথায় একটা মুণ্ডু গজিয়েছে।”

“এঁরা যদি গজল, কী দাদরা, কী কাওয়ালির ধরনে সুরে কথা বলেন, তা হলে তো এই জায়গাটা মশাই বেনারসের ডাল কা মাণ্ডি হয়ে যাবে।”

“তোমার যেমন কথা, দাঁড়কাক গলা সাধলে কোকিল হবে! এই যে বিমলের

মেয়ে রোজ সকালে গলা সেধে আমাদের পাড়া ছাড়া করার দাখিল, ওটা কি গলা! ও গলায় গান হবে! পাঁঠা কাটা গলা। সারা সকাল ব্যা ব্যা করছে, বললে, ভৈরবী সাধছি। রসুলান বাঈয়ের ঘরানা। ভাবছি, একদিন গিয়ে কাঁঠালপাতা উপহার দিয়ে আসব, খাও মা, খেয়ে কিছুক্ষণ শান্ত থাকার চেষ্টা করো।"

"এ পাড়ার সুপ্রিয় যাই বলুন বেশ গাইছে, ওই একটা ছেলে উঠবে।"

"কোন আক্কেলে বললে?"

"ভরাট গলা, জমাট সুর, তেমনি সুন্দর চেহারা।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও, কী বললে, ভরাট গলা! ভরাট নয়, শ্লেষ্মা জড়ানো। ক্রনিক ব্রংকাইটিসে তোমার গলাও ওই রকম হবে। আর সুর! উটি হাঁপানির টান। গলার কোনও রেঞ্জ আছে! সা টু সা। তারপরে যেন চড়াই পথে ঠেলা ঠেলছে, আউর থোড়া হেঁইও, বয়লাট ফাটে হেঁইও। চড়ার রে, মনে হচ্ছে বাবারে, সুরের রে নয়। চড়ার মা যেন মৃত্যুযন্ত্রণা, আয় মা সাধন সমরে। আর রূপ! যেন হোয়াইটওয়াশ করা কংস!"

"ওর গান আমার খুব ভাল লাগে। আমার রেকর্ড কোম্পানি থাকলে ক্যাসেট বের করতুম।"

"কোম্পানির তো দরকার নেই, বিশ হাজার টাকা আর ওকে নিয়ে সাউন্ড স্টুডিওতে চলে যাও। আজকাল সবাই যেমন করছে। ওই তো মঞ্জুলার ক্যাসেট বেরিয়েছে, মডার্ন সং। মনে হচ্ছে ভূতে গান গাইছে।"

"ও ছাড়ুন। সুপ্রিয়র ও কম্পোজিশনটা শুনলে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন :

গোলাপ যদি চাও/এই নাও

কাঁটা যদি চাও/এই নাও

গোলাপ আর কাঁটা পাশাপাশি

সাজাও, সাজাও/দু'জনে বেশ আছি/

একটু রাগ, একটু অনুরাগ, একটু র‍্যাপ, মিলেমিশে ফ্যান্টাসটিক।"

আমি সহজে যাব না। অনেক দিন থাকব।
শিশুরা এই ফাঁসির খেলা দেখাবে।

"কাল সকালের কাগজে একটা ফুল পেজ।"

"হ্যাঁ, একটা ফুল পেজ।"

"ফুল পেজ কী?"

"অ্যাড, মোটর গাড়ির বিজ্ঞাপন।"

'ইউ আর এ ফুল, এফ ডাবল ও এল। এই বুদ্ধি নিয়ে একটা সুপার ক্লাস কাগজের নিউজ এডিটার! দেড় লাখ টাকা মাইনে। এসি গাড়ি। আপনার উচিত গামছা বিক্রি করা। শুনুন মন দিয়ে শুনুন। একটা পুরো পাতা, লম্বালম্বি দু'ভাগ হবে। এদিকে একটা ইন্টারভিউ, ওদিকে আর একটা। লেফট সাইডে যার ফাঁসি হল তার, রাইট সাইডে যে ফাঁসি দিল তার।"

"যার ফাঁসি হল তার ইন্টারভিউ তো নেওয়া হয়নি, আই মিন নিতে দেয়নি।"

"জানতুম, এইরকম ইডিওটিক কথাই বলবে!"

"আই মিন, লোকটা তো মরে গেছে। এখন তার ইন্টারভিউ নেওয়া দুঃসাধ্য। আই মিন, সে স্বর্গেই থাক কী নরকে, আই মিন, কে যাবে সেখানে?"

"আই মিন, আপনি যাবেন, আজই যাবেন, এখুনি।"

"তা হলে আমার দুটো জিনিস লাগবে, দড়ি আর একটা টুল। জানি না, সে যেখানে গেছে, আমি সেখানে যেতে পারব কি না, যদি সাঁ সাঁ করে স্বর্গে গিয়ে হাজির হই!"

"স্বর্গে আপনি কোনওদিনই যাবেন না, আমি যেতে দেব না। আপনি স্বর্গে গেলে

আমি কোথায় যাব। স্বর্গে গিয়ে আমাকে যদি আপনার মুখ দেখতে হয়, সে হবে আমার নরকবাস। শুনুন সে স্বর্গেও যায়নি, নরকেও যায়নি, গেছে চিৎপুরে।"

"ইউ মিন চিৎপুর, দিস আওয়ার চিৎপুর, নতুন বাজার?"

"সোজা চলে যান যাত্রাওয়ালাদের গদিতে। একজন অধিকারীকে ধরে পালাকারের ঠিকানাটা জেনে নিয়ে যোগাযোগ করুন। বলুন, সেকেন্ড বাই সেকেন্ড অ্যাকাউন্ট চাই। রাত তিনটে থেকে ভোর পর্যন্ত। কী মনে হচ্ছে তাঁর। একটাই প্রশ্ন, "কেমন লাগছে?" চান করতে, পোশাক পরতে? চা খেতে? গীতা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে? অতীত আসছে কি? মাঠ, পুকুর মাছ, পানকৌড়ি। শীতের কুয়াশা, ঝাপসা খেজুর, গাছ, সিউলি রসের কলসি নিয়ে নামছে, নলেন গুড়ের গন্ধ। রোদ উঠেছে। আলোর আগুনে শিশির পুড়ে যাচ্ছে। পুকুরের জল ঝলমল করছে। এক জোড়া সুখী হাঁস। কাঠঠোকরার আকাশচেরা শব্দ। পুকুরঘাটে প্রেমিকা বাসন মাজছে। পিঠে দুলছে বাসী বিনুনি। সহবাসের ইচ্ছে করছে। সামনের ফাল্গুনে। কে? এ কী? এই তো সেই মেয়েটি। যাকে আমি খুন করেছি। মা-আ-আ। ঝপ, অন্ধকার। গভীর রাত। মাথায় কালো থলে। মুহূর্তের শেষ ভোর। এই নকল অন্ধকার একটু পরেই আসল অন্ধকার হয়ে যাবে। প্রথম কাক ডেকে উঠল। কী অদ্ভুত রসিকতা—কালো আলোর ঘুম ভাঙাচ্ছে ওঠো, জাগো, আমাদের আলো দাও। কানের কাছে খসখসে কণ্ঠস্বর, "আমাকে মার্জনা করবেন, আমি রাষ্ট্রের আইন পালন করছি মাত্র। আমার কোনও দোষ নেই।" ঘাড়ের কাছ থেকে সরে গেল জীবনের গরম নিশ্বাস। নেমে এসেছে ফাঁস। এ কি কোনও প্রেমিকার আলিঙ্গন, না কোনও কচি শিশুর নিষ্পাপ দুটি হাত।

"আমি সহজে যাব না ভাই! অনেক দিন থাকব। শিশুরা এই ফাঁসির খেলা দেখাবে। মায়ের কোল খালি করে আমার কোলে চলে আসবে। আমি জীবিত মৃত্যু। লিভিং ডেথ।"

"এইবার চলে যান ডানদিকে। জলজ্যান্ত একটা মানুষের গলায় মৃত্যুর ফাঁস পরাতে কেমন লাগল শেষ রাতের ঘোর লাগা তরল অন্ধকারে? প্রচারের আলোয় দাঁড়িয়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও ঘাতক এমন 'হিরো' হয়নি। মহারাজ নন্দকুমারকে কে ফাঁসি দিয়েছিল? কে ফাঁসি দিয়েছিল ক্ষুদিরামকে?

"চার্লস ডাফের হ্যান্ডবুক অফ হ্যাঙ্গিং বইটার সন্ধান করুন। সেখানে আইন বলছে একজন মানুষের ওজন যদি ১৪ স্টোন হয় (১ স্টোন = ১৪ পাউন্ড), তা হলে তাকে দিতে হবে আট ফুট ড্রপ। এই হল অঙ্ক। লেখা আছে ৮ স্টোন যার ওজন তাকে দিতে হবে দশ ফুট ড্রপ। ডক্টর গিলোটিনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে গিলোটিন। এর প্রথম ব্যবহার হয় ১৭৯২ সালের ২৫ এপ্রিল ফ্রান্সে।

"তা হলে কাগজের বাঁদিকে থাকবে মৃত্যু, ডানদিকে ঘাতক। মনে রাখুন, লেফট ইজ ডেথ। একটা পরিসংখ্যান দেবেন, আজ পর্যন্ত ফাঁসির খেলায় মারল ক'জন।"

"আপনি কে স্যার। দেবতা!"

"ধ্যুৎ! আমি ব্যবসাদার। শিশুর ক্রন্দন, নারীর আর্তনাদ বিক্রি করি।"

মায়ের দিকে তাকালে মনে হয়, মা এখনই কথা বলবেন

শীত, শীত, হিম-হিম সময়ে মা নেমে এলেন হিমালয়ের হিম মেখে।

মস্ত এক মাঠ। এ-পাশে ও-পাশে সদ্যপ্রয়াত বর্ষার জল ভরপুর গোটাকতক ছলছলে পুকুর। ওপারে, এপারে নিভৃত শান্তিতে প্রস্ফুটিত পদ্মপরিবার। অহংকারী হাঁসের দল সুখ-সাগরে ভাসছে। ভোরের নরম রোদ কমলালেবুর রসের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। পুবের বড় বড় গাছের ছায়া পশ্চিমে রেখা টেনেছে লম্বা লম্বা।

প্রবীণ অক্ষয়কাকা চারপাশ দেখেশুনে আরও কয়েকজন সমবয়সীকে নিশ্চিত জানলেন, "নাঃ, আর ভয় নেই। বর্ষা চলে গিয়েছে। আকাশখানার চেহারা দেখেছে। যেন নিকনো উঠোন।"

"বলছ বটে! কিন্তু শরতের সেই ফাঁপা ফাঁপা মেঘ দেখছি না তো? হাতি, হাঁস, নৌকো, পালকি!"

"বৃথাই এতদিন আকাশ দেখলে। ওসব বেরবে বেলা বারোটার পর উত্তর আকাশে। পাখিদের গলা শুনে বুঝতে পারছ না। ঝন ঝন করছে। খঞ্জনা পাখির খঞ্জনি।"

প্যাণ্ডেল বাঁধা প্রায় শেষ। আর ছ-সাতখানা বাঁশ পড়ে আছে মাত্র। তেরপলের পাট খোলা হচ্ছে। নাদুকাকা দু-কোমরে হাত রেখে তদারকি করতে করতে বলছেন, "সেবারের মতো এবারে তেবপলে ফুটোফাটা নেই তো!"

"একটা দুটো যে নেই তা কেমন করে বলি! মা কালীর কৃপা।"

"তার মানে?"

"কালীপুজোর রাতে হাউইও পড়ে। গত্ত হয়ে যায়।"

শীতের হাওয়া এসেছে। চারপাশ খড়খড়ে শুকনো। উঁচু ডাঙায় কাশফুলের শোভা। মাঠের শেষে বকুল দিঘির ধারে বাগান-ঘেরা বিশাল জমিদার বাড়ি। বছরে একবার এই পুজোর সময় কলকাতা থেকে সবাই আসেন। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। লোকজন, কল-কোলাহল। আসছে, যাচ্ছে। দিঘিতে জাল নামছে। এই পুজো ওই জমিদারবাবুদের।

মাঠের পথ ধরে ঢাকিরা আসছেন। একটা মাত্র ঢাকে ছাড়া কাঠি পড়ছে। সঙ্গে আছে সেই ছেলেটি, যার নাম কেষ্ট। কাঁসি বাজায়। এখনও বাজাচ্ছে অন্যমনস্ক বাজনা। জানান দিচ্ছে—আমরা এসে গিয়েছি। ঢাকের বাদ্যে মা আসছেন, ওই আলের পথ ধরে, তালগাছের সারির ভিতর দিয়ে।

পুকুরঘাটে মায়েদের বাসন-মাজা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ। হাত আলগা পড়ে গেল। কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়ে খুশি খুশি মুখে দেখছেন, ঢাকিদের আগমন। বাচ্চারা পিছন পিছন ছুটছে। তাদের মুখে ঢাকের বোল, ট্যাং টাটাটা, ট্যাংটা ট্যাং।

সবচেয়ে ছোটটা ছাগলছানার মতো তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে।

আশুকাকার চালায় মায়ের মূর্তি তৈরি হচ্ছে। আর তো দেরি সয় না। "ও আশুকাকা আর তো দেরি সয় না।"

"যাঃ, দিলি তো হাতটা নাড়িয়ে।"

"আমি তো কত দূরে। হাতটা নাড়ালুম কী করে?"

"দম বন্ধ করে মায়ের চোখ আঁকছিলুম। মনটা ঘুরে গেল। হাতটা কেঁপে গেল। মায়ের চোখ আঁকা কি সহজ কাজ রে। মায়ের চোখ দুটোই তো সব।"

"সিংহটা তুমি দেখার মতো করেছ। অসুর এবার একটু রোগা হয়েছে।"

"হবে না? ম্যালেরিয়ায় ধরেছিল সত্যিই তাই। যখন পুজো হয়, মায়ের দিকে তাকালে মনে হয়, মা বুঝি এখনই কথা বলবেন। কত রাতে স্বপ্ন দেখেছি, দিঘির উত্তর পাড়ে যেদিকটা সবচেয়ে নির্জন, কচু আর মানকচুর ঝোপঝাড়, মা সেখানে আলো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, ভুস ভুস করে শিউলি ঝরে পড়ছে। জিজ্ঞেস করেছিলুম, "মা, তুমি এখানে কেন?"

মা বললেন, "তুই কে?"

"মা আমি একটা ছেলে। ওই গোঁসাইপাড়ায় বাড়ি। তারাচাঁদ স্কুলে পড়ি।"

"শোনো, আমি আসলে গাছ। কলাগাছে আমি দেবী ব্রাহ্মণী, কচুগাছে কালিকা, হলুদ গাছে দুর্গা চামুণ্ডা, ধানগাছে লক্ষ্মীদেবী।"

ভারে ভারে জিনিসপত্র এসে জমিদার বাড়িতে জমা হচ্ছে। সারাটা দিন আমরা সবাই মাঠেই পড়ে আছি। দড়ি বাঁধা হচ্ছে। ঠক ঠক করে পেরেক ঠোকা হচ্ছে। বড়দের কেউ কেউ গাছের ছায়ায় বসে আছেন। মাঝে মাঝেই নিবারণবাবুর ডাক পড়ছে জমিদার বাড়িতে। তিনিই প্রধান কর্মকর্তা। জমিদারবাবুর সবচেয়ে বিশ্বাসী মানুষ।

যেই তেরপল চাপল, অমনি ছায়া নামল অত বড় মাঠের ওই জায়গাটুকুতে।

সবুজ সবুজ ঘাস যেন আরও স্পষ্ট হল। দুটো সুন্দর প্রজাপতি ঘুরে ঘুরে উড়ছে। রব উঠল, "মা আসছেন, মা আসছেন।" জোড়া জোড়া শাঁখের আওয়াজ। কেষ্টটা নেচে নেচে কাঁসর বাজাচ্ছে। মা এসে বসলেন মঞ্চে। ভীষণ চেঁচামেচি। ওদিকটা তোলো, ওখানে একটা কাঠের টুকরো ঢোকাও। সিংহের লেজটা কি একটু চোট খেল? আরে, প্যাঁচাটা গেল কোথায়! গণেশের ইঁদুর!

যাত্রার দল এসে গিয়েছে। স্কুলবাড়িতে থাকার জায়গা হয়েছে। মাস্টারমশাইদের বসার ঘরে বাজনার রিহার্সাল হচ্ছে। একা ক্লারিওনেট খুব চড়ায় উঠে সঙ্গী খুঁজে না পেয়ে কান্নাকাটি করছে। যেখানে টিউবওয়েল, তার সামনের একটা ঘরে হয়েছে দলের রান্নাঘর। ভোঁ ভোঁ শব্দে স্টোভ জ্বলছে। হাণ্ডা কেটলিতে চায়ের সাগর। কিছু সমস্যা তৈরি হতে না হতেই চিৎকার—"চা লাগাও, চা লাগাও।"

নায়ক রকের ধারে দাঁড়িয়ে নুন জলে গার্গল করছেন। বর্ধমানে পালা করতে গিয়ে এমন চিৎকার করেছেন গলা ক্র্যাক করে গিয়েছে। জিজ্ঞেস করছেন, "কাছাকাছি কোনও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন?"

নায়িকা, তিনি পুরুষ, ভ্যাঁচ করে হেঁচে বললেন, "আমার কাছে বচ আছে প্রাণনাথ।"

বেহালা করুণ সুরে ককিয়ে উঠল। বিশাল একটা কুমড়ো রান্নাঘরে বসে আছে। পাশে পুঁইশাক। জমিদার বাড়ি থেকে এইমাত্র বিরাট একটা কাতলা মাছ এল। হেড কুক ভুরু কুঁচকে বিড়ি খাচ্ছেন আর ভাবছেন মেনুটা কী হবে!

গার্গলের ফাঁকে একটু সময় করে নিয়ে নায়ক বললেন, "মুড়োটা মুগের ডালে ঢুকিয়ে দাও।"

মহিষাসুর দেয়ালের দিকে মুখ করে হাসি প্র্যাকটিস করছেন। মা দুর্গার বিড়ির কৌটো হারিয়ে গিয়েছে। মহিষাসুরকে বলছেন, "আবার সরিয়েছিস?"

উত্তরে অসুরের হা হা হাসি। মারামারি হয় আর কী!

সন্ধ্যা নামল। পশ্চিম আকাশে ওই একটি তারা। বোধনের বোলে ঢাক বাজছে। প্রতি বছর আমাদের বাউলদাদা কোথা থেকে কোথা থেকে না চলে আসেন। তিনি

নেচে নেচে গাইছেন,

বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন, ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী, আসবে কত দণ্ডী জটাজুটধারী।

মায়ের পূজা করবেন আমাদের হেডস্যার। কী তাঁর সংস্কৃত উচ্চারণ, মায়ের হাতের ধারাল অস্ত্রের মতো। তন্ত্রধারক, আমাদের হেডপণ্ডিত। মহাদেবের মতো চেহারা। গরদের জোড় পরে তাঁরা বসেছেন আসনে। মায়েরা কোরা কোরা খড়বড়ে শাড়ি পরে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ফুঁ ফুঁ শাঁখ। গাল ফুলছে, গাল কমছে। আলোছায়ায় সব দাঁড়িয়ে। মায়ের যোগিনীরা। দূরে জেনারেটর চলছে বিকট শব্দে। প্রান্তর পেরিয়ে ছুটছে বিদ্যুৎ তৈরির সেই আওয়াজ। কালো আকাশের তলায় কাশের সাদা চামর ঢুলে ঢুলে পড়ছে। টিপ টিপ আলোর মালায় ঘেরা পূজা মণ্ডপটি যেন অন্ধকারে আলোব দ্বীপ।

কোথায় গেল সেই গ্রাম! সদ্ভাব, সম্ভাবনা! জমিদার বাড়ির একটা পাশ ধসে পড়ে গেল একদিন। সমাজে ধস নামল। মানুষের চেহারা পালটে গেল।

বিশ্বাসের মৃত্যু ঘটল। সন্দিগ্ধ 'নতুন' এসে সব ছারখার করে দিল। আরও জাঁকজমকের বারোয়ারিতে মা সাবধানে পা টিপে টিপে এসে ক'টা দিন অস্বস্তিতে কাটিয়ে পা টিপে টিপে চলে যান। জোড়া নীলকণ্ঠ আর আসে না। শহর আর শব্দ, ভ্রান্তি আর বিভ্রান্তি। মূল হারিয়ে গেল তুমুলে।

সত্যি ভূতের গল্প

প্রথমেই সাহস করে সত্যিটা স্বীকার করি। কথাটা হল আমি বিজ্ঞানের ছাত্র বটে। কিন্তু আমি ভূতে বিশ্বাস করি। প্রায়ই আমি চারপাশের নানা অশরীরীর উপস্থিতি টের পাই। আমি যখন একলা ঘরে থাকি তখন মনে হয় এইসব আত্মারা যেন আমার সঙ্গে আছেন। ব্যাপারটাকে অবিশ্বাসীরা বলেন, আমার অতিরিক্ত কল্পনাশক্তির ফল। জ্যোতিষীরা বলেন, আমার জন্ম ছকে কেতু নাকি এমন একটা অদ্ভুত জায়গায় রয়েছে যে আমার এ সমস্ত অনুভূতি হচ্ছে। তা কল্পনাই হোক বা কেতুকীর্তিই হোক, মাঝে মাঝেই আমার জীবনে ভৌতিক ঘটনা ঘটে।

এ রকম একটা গল্প শোনাই। একবার আমি আসানসোলে এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি। তাদের বিরাট দোতলা বাড়ি। একতলা থেকে দোতলায় ওঠার কোনও সিঁড়ি নেই। পাশের একটা রাস্তা দিয়ে দোতলার সিঁড়িটা সোজা উঠেছে। অর্থাৎ একতলার দরজা বন্ধ করে দিলে দোতলাটা নীচের তলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দোতলাটা অবশ্য খুব প্রশস্ত ও ছিমছাম। ঘরের লাগোয়া, চওড়া বারান্দা। তার শেষপ্রান্তে কলঘর। বারান্দার সামনে বাগানের আম, জাম, কাঁঠাল, নিমগাছের ডালপালা এসে পড়েছে। দোতলার একটা বড় ঘরে আমার শোয়ার জায়গা হয়েছে।

সে রাতে অবশ্য দোতলার বাসিন্দা আমি একাই। আমার আত্মীয়রা আমার শোয়ার ব্যবস্থা করে শুভরাত্রি জানিয়ে নীচে চলে গেলেন। আমি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। নতুন জায়গা, নতুন বিছানায় শুয়ে ঘুম আর আসে না। খানিকক্ষণ পরে বাথরুমে যাওয়ার জন্য বারান্দায় বেরোলাম। তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। চারিদিকের আলো নিভে গিয়েছে। স্ট্রিটলাইটের আলো বাগানের ঝাঁকড়া গাছের ফাঁক দিয়ে পড়ে বারান্দায় বেশ একটা আলো-আঁধারি তৈরি করেছে। সেই আলোতে দেখলাম বারান্দায় একটা ড্রেসিং টেবিল অকারণে পড়ে আছে। তার কাচের গায়ে এক পরত ধুলো। হঠাৎ আয়নার মধ্যে দিয়ে তাকাতেই চমকে উঠলাম। আয়নায় একটা প্রতিফলন পড়েছে ঠিকই। কিন্তু সেটা আমার নয়, একজন বৃদ্ধার মুখ। প্রথমে ভাবলাম ঘুম চোখে কী দেখতে কী দেখেছি। কিন্তু দু'-তিনবার তাকিয়েও একই জিনিস দেখলাম। তখন আমি প্রায় জোর করেই আর আয়নার দিকে না তাকিয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে সোজা শুয়ে পড়লাম। বারান্দার আলোটা অবশ্য জ্বেলেই রেখে এলাম।

তন্দ্রা এসেছিল হয়তো। হঠাৎ অনুভব করলাম আমার কপালে কার যেন বরফঠাণ্ডা প্রশ্বাস পড়ল। আমি বিছানা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। এরপর আমি ঘুমিয়ে ছিলাম নাকি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম জানি না। সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল। আমি বারান্দার সেই আয়নার দিকে তাকাতেই দেখলাম আমার কপালটা যেন কালো হয়ে গিয়েছে। হাত দিয়ে কেমন ফ্যাকাসে লাগল।

নীচে নেমে একতলায় চায়ের টেবিলে বসে রাতের ঘটনাটা বলব কি না ভাবছি। ইতিমধ্যে আমার কপালের দিকে সকলের নজর পড়েছে। কেউ বললেন, অ্যালার্জি থেকে এরকম হয়েছে। আবার কেউ বললেন কপালে যেন ভূতের ছাপ পড়েছে। আমি গত রাতে আয়নায় দেখা সেই বৃদ্ধার চেহারার বর্ণনা দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম এরকম কেউ এই বাড়িতে মারা গিয়েছেন কি না। জানা গেল, এ বাড়ির শাশুড়ি শেষজীবনে খুব অসুখী হয়ে মারা গিয়েছেন। ফামিলি-অ্যালবাম থেকে এই শাশুড়ির ছবি দেখে বুঝলাম, আয়নায় এই বৃদ্ধারই মুখের ছায়া পড়েছিল।

এরপর স্নান সেরে আমি ওই ঘরে চণ্ডীপাঠ করলাম। পুজো সেরে বারান্দায় বেরিয়েছি। হঠাৎ দেখি, গাছের ডালে একটা কাক ঠ্যাং আটকে ঝুলে রয়েছে। বাড়ির সকলে অবাক। রাতে ঝড়-বাদলাও হয়নি। গাছের কাছ দিয়ে কোনও ইলেকট্রিক তারও যায়নি। অথচ একটা সুস্থ সবল কাক মরে ঝুলে আছে। তখন আমার মনে হল গত রাতে যে অতৃপ্ত আত্মা এসেছিলেন, তিনি একটি প্রাণ চেয়েছিলেন। তাঁর আসার চিহ্নটা রেখে গিয়েছেন আমার কালো হয়ে যাওয়া কপালে। আর আমার বদলে ওই কাকটারই পোড়া কপালে জুটেছিল মৃত্যু। আসলে কপালের লেখা কে আর খণ্ডাবে বলো।

মরে গেলে কী হয়!

মানুষ মরে গেলে কী হয়, তোমার জানা আছে?

অবশ্যই আছে। মরে গেলে আর খেতে হয় না ভাই। খাওয়ার হাত থেকে চির নিষ্কৃতি। কে রাঁধলে, কেমন রাঁধলে। অখাদ্য না সুখাদ্য? নুন বেশি না নুন কম! এই নিয়ে নিত্য অশান্তির হাত থেকে মুক্তি। রাঁধুনি এল কি গেল জানার দরকার নেই। কেউ জিজ্ঞেস করবে না, সকালে কী হবে, রাত্তিরে কি হবে? ঢেঁড়শ, বিচিঅলা পটল, খসখসে ঝিঙ্গে, টেলাপিয়ার 'টেলপিস'। তিতকুটে নকল পোস্ত। নিষ্কৃতি। খেতে হবে না বলেই হজম করার দুশ্চিন্তা থাকবে না। ঘনঘন অ্যান্টাসিড আর অ্যান্টি অ্যামিবিক চুষতে কি গিলতে হবে না। হার্টকা ধড়কন সহ্য করতে হবে না। ডাক্তারদের ডোন্ট কেয়ার। ভয় দেখিয়ে বাই পাস। আমারই পা থেকে কুঁচকি পর্যন্ত ফেঁড়ে ধমনী তুলে নিয়ে, হাতের খেল দেখিয়ে, তিন লাখ টাকা মাইনাস করে দিতে পারবে না। অষ্টপ্রহর কানের কাছে গুন গুন করতে পারবে না পরিচিত পরিজন—ক্যানসার নয়তো! ঢোক গিলতে লাগছে? সে কী? কত দিন? সর্বনাশ! এ আমার শালার কেস। একটা বায়পসি মেরে দাও। রেগে গিয়ে বলেই বসলে, না হে ভগ্নীপোত।

মরে গেলে সবচেয়ে বড় সুখ, একদিন, দুদিন অন্তর বউয়ের সঙ্গে ঝটাপটি

করতে হবে না। আঃ কী আরাম! আমি সধবা চললুম, টাটা বাইবাই। তুমি বেধবা থাকো পড়ে। নাতি, নাতনী সামলাও। আজ দুর্গাপুরে, কাল ভূপালে। বগলে রঙচটা, ত্রিভঙ্গমুরারী ছাতা নিয়ে পোস্টাপিসে পেনসান আনতে যাও। অফিসারের মুখচন্দ্র দেখো। যেন সাঁতরাগাছির ওল। ভরা যৌবনে সে কী অহংকার! মেয়েছেলে হয়ে জন্মে যেন মাথা কিনে নিয়েছিল লেডি দুর্যোধন—বিনা রণে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।

মরে গেলে কী হয়? চাকরিতে ছুটতে হবে না। অসভ্য কিছু মানুষের দুর্ব্যবহার পেটের দায়ে সহ্য করতে হবে না। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা মাইনে তো কিছু কম পান না। দিব্যি তেল চুকচুকে চেহারা। এই তো কাজের নমুনা। এটা কি আপনার মামার বাড়ি? থমথমে মুখে বাড়ি ফিরেই সুসংবাদ, ছেলে জয়েন্ট এনট্রেনস পায়নি, গুম মেরে বসে আছে। মরে গেলে এই চক্করের বাইরে। কার বউ, কার ছেলে, কার মান, কার অপমান!

মরে গেলে লোক-লৌকিকতার ধকল থেকে নিষ্কৃতি। নিমন্ত্রণপত্রে পথনির্দেশ দেওয়া থাকে। শিয়ালদহ স্টেশন হইতে ট্রেনে অমুক স্টেশন। অটোয় গজার মোড়। তারপর টেম্পো। বুড়ো শিবতলা থেকে ভ্যান রিকশ। ইটখোলা থেকে দশ মিনিটের হাঁটা পথ। আজকাল কথায় কথায় কবিতা। শুক্লা দ্বিতীয়ার মধ্যযামে/ছল ছল আকাশে তারাদের সাক্ষী রেখে/ দুটি আত্মা একত্রে মিলিত হয়ে

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমায় পূর্ণমেবাব শিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

বিঃ দ্রঃ কোনও উপহার নয়, শুধু আশীর্বাদ। সঙ্গে একটি টর্চ লাইট।।

এরপর হাতে লেখা, অবশ্যই আসা চাই। তা না হলে তোর মেয়ের বিয়েতে মাখা সন্দেশ নিয়ে যাব না।

মরে গেলে একটা মানুষের এই উপকার হয়, রোজই তাকে এই বিরক্তিকর পুরনো পৃথিবীতে জেগে উঠতে হয় না। খ্যা খ্যা করে কাক ডাকছে। ধোঁয়া ধোঁয়া সকাল। ভ্যাপসা গরম। খ্যাঁস খ্যাঁস করে দাঁত মাজা, বাসন মাজার মতো। তারপর এক কাপ চা। ফ্লেভার নেই শুধু লিকার। এক চুমুকেই মুখ টক। তার মানে, বাবু জাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে জাগল অম্বল, টেনসান, ফ্রাসট্রেসান। শুরু হল ঘাম। এমন একটা দেশ যেখানে আট মাস শুধু ঘামো, ঘেমে যাও। তারপরে খবরের কাগজ। মেরেছে, মরেছে, পুড়িয়েছে, ধর্ষণ করেছে। নেচেছে, নাচিয়েছে। ডাকাতি করেছে। গল গল করে স্তান দিয়েছে। ডাহা ডাহা মিথ্যে কথা। মরে গেলে খবরের কাগজ আর পড়তে হবে না। টেলিভিশনে সিরিয়াল দেখতে হবে না। দেখতে হবে না মুখোমুখি, হার্ড টকস্, কচি কচি মেয়েদের জাম্বো নাচ। মরে গেলে সবচেয়ে ভাল যা হয়, সব রোগ ভাল হয়ে যায়।
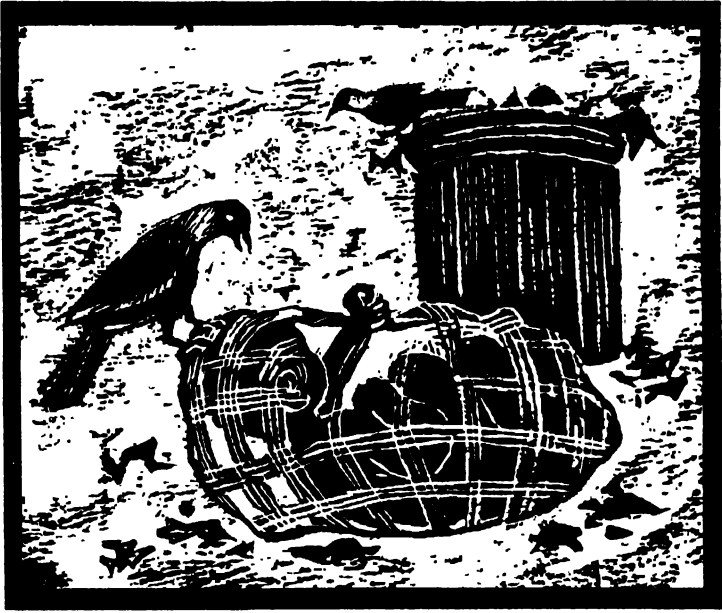
প্রধানমন্ত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মাসিক বরাদ্দ ২৩ লাখ

শাস্ত্র বলছেন, পরশ্রীকাতরতা আর পরস্ত্রীকাতরতা—দুটোই খুব খারাপ। এই দুটো থাকলে স্বর্গে যাওয়া যাবে না। নরকে যেতে হবে। নরক একটি বহুতল ব্যাপার। এক এক তলে এক এক কাণ্ড। কোনওটার প্রবেশদ্বারের মাথায় লেখা আছে—কুম্ভীপাক। কোনওটার বাইরে রৌরব। কুম্ভীপাকে বিশাল বিশাল লোহার কড়ায় তেল ফুটছে, সেই তেলে পাপীদের 'ডিপ ফ্রাই' করা হচ্ছে।

খবর নিয়েছিলুম, কড়া, তেল এ সব কোথা থেকে কেনা হয়। ওখানকার 'ইনচার্জ' পশ্চিমবাংলারই এক পাপী। গুড কন্ডাকটের জন্য যমরাজ ইনচার্জ করে দিয়েছেন। ইনচার্জ মানে 'হেডকুক'। এখানে 'ক্যাটারিং বিজনেস' ছিল। তাঁর খাবার খেয়ে বহু লোক 'ফুড পয়েজনিং'-এ মারা গিয়েছে। শেষে পঞ্চাননতলায় ষাঁড়ের গুঁতোয় সাতদিন ভুগে মারা গেলেন। সবাই ভেবেছিল, শিবের বাহন যখন কৃপা করেছেন, তখন স্বর্গেই 'বার্থ' পাবেন। ও বাবা! প্রাণবায়ু বেরিয় যাওয়ার পর তিনি যখন জীবনের চৌকাঠ ডিঙোলেন, শ'পাঁচেক ছায়া ছায়া পুরুষ, রমণী, এরা সবাই ফিশ রোল খেয়ে মরেছিল, হাঁই মাঁউ করে তেড়ে এল, পৌঁছে দিল নরকে।

ইনচার্জ বললেন, "কড়া আসে হাওড়া থেকে। বিধান রায়ের আমলে হাওড়াকে

লা হত 'শেফিল্ড অফ ইন্ডিয়া'।' একদল পরোপকারী, মানব দরদী, হিতব্রতী মানুষ ৎকার, চেঁচামেচি করে একের পর এক কারখানা উঠিয়ে দিল। আট ঘণ্টা বিশ্রী রিশ্রম থেকে মুক্তি পেয়ে তারা চৌকি পেতে তাস খেলতে বসল। মাঝে মাঝে মস্বরে মন্ত্রপাঠ, চ্যান্টিং, 'চলবে না, চলবে না। ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।' এ সব র্মের জগতের উচ্চমার্গের কথা। চলবে না, মানে বেঁচে থাকা চলবে না। গুঁড়িয়ে ও মানে, 'মায়া'কে অ্যাটাক করো। মায়ার বাঁধন কেটে মুক্ত হয়ে যাও। তারপর রু হল সপরিবারে উপোস। তুরুপের টেক্কা মেরে সোজা স্বর্গে। ভগবান প্রাইভেট নক্রেটারিকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কী, পিল পিল করে এত ৩া শোলমাছের ঝাঁকের মতো আসছে কোথা থেকে?"

"স্যার পশ্চিমবঙ্গ থেকে।"

"অবাক কাণ্ড, পঞ্চপাণ্ডবরা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, যুধিষ্ঠির নরকে গেল, আর রা কেমন 'স্মুথলি' চলে আসছে!"

"আজ্ঞে প্রবল সাধন আর ভজন। মাসের পর মাস মন্ত্রপাঠ, নিয়মিত মিছিল, রুভক্তি, আর 'চাম্বু উপবাস'।"

"নিরম্বু শুনেছি, চাম্বুটা কী?"

"এই এতটুকু এতটুকু এক কাঁচ্চা ভাঁড়ে এক গজ চা।"

"এক কাঁচ্চায় এক গজ? অঙ্কে ভুল হচ্ছে।"

"স্যার তিন ফুটে এক গজ। তিন বার ফোটানো চা।"

"এই কড়াগুলো সব কড়া-ভুত। হাওড়ার বন্ধ, বন্ধ কারখানায় হাজার হাজার ড়া পড়ে থেকে থেকে ভূত হয়ে গেল, আমরা জাল টাকা দিয়ে কিনে নিলুম। এটা তা পাপ আর পাপীদের জায়গা। ভেজাল তেলে পাপীদের আলুর চাপের মতো াজা হচ্ছে।"

"এদের তোলা হবে কবে?"

"খেপে খেপে। রথের সময়। রথের সময় চপ, পেঁয়াজি, পাঁপর খেতেই হয়।'

নরকে যেতে হবে জেনেও পরশ্রীকাতর না হয়ে পারছি না। প্রধানমন্ত্রীদের স্বাস্থ্য ক্ষার জন্য মাসিক বরাদ্দ তেইশ লক্ষ টাকা। ক্ষমতাসীন এবং 'এক্স' সকলের জন্যই ই ব্যবস্থা। তালিকায় আছেন বর্তমান এবং প্রাক্তন ছ'জন। আছেন শ্রীমতী সোনিয়া ও তাঁর আত্মীয়স্বজন। কোনও হিসাব নেই, যত খুশি তত। ভি পি সিং-এর চিকিৎসার জন্য আজ পর্যন্ত পনেরো কোটি গিয়েছে। দামি জীবন। চলে গেলে, অস্ত গেলে জাতির ক্ষতি। প্রধানমন্ত্রীর শরীর 'ফিট' রাখার জন্য, ইংরাজিতে যাকে বলে 'ফিট ্যাজ এ ফিড্‌ল'—অ্যানেসথেসিস্টস পাঁচজন, সার্জেন পাঁচজন, ব্যক্তিগত ডাক্তার জন, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে চোদ্দোজন প্যারামেডিকো স্টাফ দিবারাত্র হাজির। জার্মানি থেকে আনানো হয়েছে চারটে মার্সিডিজ অ্যাম্বুল্যান্স।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও সরকারি খরচে আমেরিকা থেকে চিকিৎস করিয়ে এলেন পাঁচ কোটি টাকায়। তাঁর জন্য নিযুক্ত আছেন পাঁচজন ডাক্তার, পাঁচজ প্যারামেডিক, একজন কার্ডিয়োলজিস্ট। সর্বক্ষণের জন্যে একটি অ্যাম্বুল্যান্স দরজায় খাড়া।

মাসিক খরচের তালিকা এই রকম, 'প্রধানমন্ত্রীর খরচ প্রতিমাসে : ডাক্তারদে জন্য ১৪ লক্ষ, প্যারামেডিকদের জন্য ৩১ লক্ষ, ওষুধপত্র ৫১ লক্ষ, অ্যাম্বুলেন্স ১: লক্ষ।

"আমার ঈর্ষার কারণ? দেশ শাসনের বড় নেতা, মাঝারি, ছোট, কুচো নেতার প্রয়োজন আছে কি নেই?"

"আছে।"

"তাঁদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব কে নেবে? দেশের মানুষ অবশ্যই।"

"শাস্ত্র কী বলছেন, রাজা ভগবানের সমান। রাজা বাঁচলে রাজ্য বাঁচবে। একটি তিন বছরের মেয়ের হার্টে ফুটো। মেরামতের খরচ তিন লাখ।"

"একে মেয়ে তায় ডিফেকটিভ। চুপ করে বসে থাকো। ও শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে যা হবার হবে।"

"তার আগেই তো মারা যাবে!"

"ধুস। প্রবাদ কী বলছে, মেয়েদের জান কই মাছের প্রাণ। তুমি মন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করো, মেয়েটা বেঁচে যাবে।"

আর যা-ই করো, বিপজ্জনক রকমের বড়লোক হয়ো না

সেকালের ডাকাতদের কোনও তুলনা একালে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সকালে জমিদার, রাত্তিরে ডাকাত। আমার মেসোমশাই যথেষ্ট ধনী ছিলেন। হরেকরকম ব্যবসা করে এত টাকা করে ফেললেন যে, ডাকাতদের লিস্টে নাম উঠে গেল। মাসিমা অনেকবার সাবধান করেছিলেন, আর যা-ই করো বিপজ্জনক রকমের বড়লোক হয়ো না।

মেসোমশাই করুণ গলায় বলেছিলেন, "আমি কি ইচ্ছে করে হচ্ছি! জোয়ারের জলের মতো টাকা এলে আমি কী করব! টাকায় আমার অরুচি ধরে গেছে।" যাতে হাত দিচ্ছেন সেটাই লেগে যাচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ভাইরে! একেই বলে কপাল!" ডাকাতের চিঠি এল :

প্রিয় ব্রজবাবু, আগামী বুধবার আমরা আপনার অতিথি হব। তা জনা-পঞ্চাশ। মায়ের পুজো সেরে বেরোতে বেরোতে মধ্যরাত হবে। এর আগে সাধারণত আমরা কোথাও যাই না। ফুলকো ফুলকো লুচি আর পাঁঠার মাংসর ব্যবস্থা রাখবেন। চার পাঁচ রকমের ভাল মিষ্টি অবশ্যই। মঙ্গলবার যে কোনও সময় আমাদের একজন যাবে একটা সাইন বোর্ড নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বাইরে ঝুলিয়ে দেবেন। আপনার সম্মান বাড়বে। আমরা যেখানে-সেখানে ডাকাতি করি না। আমাদের দল, এক নম্বর বনেদি দল। আমরা তিন পুরুষের ডাকাত। কোনও ভেজাল নেই। মায়ের দিকে তিন পুরুষ বাপের দিকেও তিন পুরুষ। একমাত্র আমাদের দলেই সাতটা 'মসার' পিস্তল। দশটা গাদা বন্দুক আছে। আমরা অন্য দলের মতো মরচে ধরা তরোয়াল, টিনের প্যাতপ্যাতে খাঁড়া, পাকা বাঁশের লাঠি, এসব ব্যবহার করি না। রণপা-র প্রয়োজন

হয়.না। ও-সব ভড়ং। সার্কাস। নিকৃষ্ট ডাকাতরা ববহার করে। আমরা রেজিস্টার্ড। পুলিশকে নিয়মিত চাঁদা দি। কমসে কম দুশো মেয়ের ভাল পাত্রে বিয়ে দিয়েছি নিজে বসে থেকে। হাজার বিধবাকে কাশী, বৃন্দাবনে পাঠিয়েছি। নিয়মিত মাসোহারা পায়। আমার পূর্বপুরুষরা ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে নরবলি দিত। হিংসা আমি সহ্য করতে পারি না, তাই কুমড়ো বলি দি। আমার স্ত্রী পরে ছক্কা রেঁধে মহাপ্রসাদ হিসেবে বাড়ি-বাড়ি পৌছে দিয়ে আসে।

আমার বাড়িতে দোল দুর্গোৎসব সবই হয়। নিত্য দরিদ্রনারায়ণ সেবা! ইতি, বিনীত বিশ্বনাথবাবু।

চিঠিটা পাওয়ার পর পাড়াসুদ্ধ লোকের সে কী আনন্দ—ব্রজ, এতদিন তুমি একটা বড়লোকই ছিলে, আজ তুমি জাতে উঠলে। ব্রাহ্মণ সন্তানের যেমন পৈতে হয়।

প্রায় তিন বিঘে জমির উপর চক মেলানো বাড়ি। দু'খানা পুকুর। আম, জাম, লিচু, সবেদা, কাঁঠাল গাছ। অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে ম্যারাপ বাঁধা হল। বিশ্বনাথবাবু বসবেন। কার্পেট ঢাকা মঞ্চ। রুপোর নল লাগানো ফর্সি। অম্বুরি তামাক। সাদা পাগড়ি মাথায় মেসোমশাইয়ের কর্মচারীর দল। গোরা ব্যান্ড এসেছে। ভিয়েন বসেছে। বিরাট বিরাট সাইজের ডাকাতে লাড্ডু তৈরি হচ্ছে। যেন মেসোমশাইয়ের মেয়ের বিয়ে।

সকাল থেকেই উদ্বিগ্ন। বিশ্বনাথ ডাকাতবাবুর সাইনবোর্ড তো এল না। সাইনবোর্ডে লেখা থাকবে, 'বিশ্বনাথবাবু কৃপা করেছেন'। এল না কেন! 'কৃপাবোর্ড' এল না কেন? সকলের মুখে মুখে একই উদ্বেগ। ডাকাতরা যে আসছে, তার আবার সিগন্যাল ছিল। দূরে রাতের আকাশ ফুঁড়ে পর পর তিনটে তারাবাজি উঠে ফুল ছড়াবে। তিনখানা আগুনে-মালা আকাশ পথে দুলতে দুলতে যে বাড়িতে ডাকাতি হবে, সেই বাড়ির দিকে এগিয়ে আসবে।

সূর্য ডুবতে না ডুবতেই চারপাশ আলোয় আলো। সবাই উৎসবের সাজে সেজে উঠল। মেয়েদের মাথায় বড় বড় খোঁপা। গলায় চিকচিকে সোনার হার। রঙ-বেরঙের শাড়ি। মেসোমশাই পরেছেন চুনট করা ফরাসডাঙার ধুতি। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি। হাতে দুলছে মোষের শিঙের স্টিক। গোঁফে আতর। রাত আটটার সময় রব উঠল, আসছে, আসছে, ঘোড়া আসছে, কৃপা আসছে। এল একটা চিঠি। প্রিয় ব্রজবাবু, আমাদের ভুল হয়েছে। আপনারই গ্রামের স্বরূপ দামোদরবাবু আবেদন করেছেন, তিনি আপনার চেয়ে ঢের বড়লোক। তাঁর কাছে বাদশাহি মোহর আছে, যা আপনার নেই। আমি দুঃখিত। ইতি,

মেসোমশাই হাত থেকে ছড়ি ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমি মামলা করব।" সব গল্পেই যেমন হয়, মধুরেণ সমাপয়েৎ। প্রবীণদের পরামর্শে মেসোর বড় মেয়ে চম্পার সঙ্গে দক্ষিণপাড়ার বিশ্বনাথের বিয়ে হল ওই রাতে। তিনি ডাক্তার, নাম-করা ডাকাতের বদলে ডাকতার এল ঘরে।

মারতে পারলে বাঁচবে,
না পারলে হরি হরি বোল

প্রতি মুহূর্তে কেউ না কেউ কারও না কারও নামে কিছু না কিছু বলছেই বলছে। এই পৃথিবীটা হল বলাবলির পৃথিবী। 'বলা-বলি' হল টাকার মতো! এ-পিঠে রাজার মুখ, ও-পিঠে বিভিন্ন ভাষায় উৎকীর্ণ মূল্যমান। একজন সম্পর্কে এ-পিঠে আমরা যা বলিনি, ও-পিঠে নির্দ্বিধায় আমরা তা বলবই বলব। সেই বলাটাই সেই মানুষটির মূল্যমান।

স্ত্রী বলবেন, স্বামী বলবেন, ছেলে বলবে, মেয়ে বলবে, বন্ধু বলবে, শত্রু বলবে, বাবা বলবে, মা বলবে। সঙ্কীর্তনে কারও চুপ করে থাকার উপায় নেই। বৃদ্ধ এই পৃথিবীতে কত না কত বছর মানুষকে থাকতে হবে। কত রকম দেখতে হবে, শুনতে হবে। বড় হতে হবে, বুড়ো হতে হবে, একদিন মরে যেতে হবে। কী নিয়ে থাকা যায়! সারা জীবন ক্লান্তিকর শ্বাসের হাপর টানা। আমার হয়ে অন্য কেউ শ্বাস টানলে

চলবে না। আমাকেই ভোঁস ভোঁস করে, ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে যেতে হবে। এমনকী, ঘুমিয়েও শান্তি নেই। অবিশ্রাম এই ফোঁস ফোঁস। এসব ফোঁস ফোঁস এক জায়গায় জড়ো করে শুনলে ধারণা হবে, পৃথিবীটা কেউটে সাপের।

চতুর্দিকে ফণী আর ফণা।

একজন আর একজনকে দেখে উদাত্ত গলায় বললেন, "কাকাবাবু কেমন আছেন?"

কাকাবাবু দূরত্বে সরে যাওয়ামাত্রই বন্ধুকে বললেন, "এ পাড়ার একটি মাল।" ওদিকে কাকাবাবুকে কেউ জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলছিল? খুব কাকাবাবু, কাকাবাবু!"

কাকাবাবু একটি শব্দেই খতম করে দিলেন 'ধান্দাবাজ'।

প্রশ্নকারী আরও গভীরে চলে গেলেন, "ওর চোদ্দো পুরুষ ধান্দাবাজ।" পাশে আর একজন ছিলেন, তিনি আর একটু 'ইলাবোরেট' করলেন, "বউ নাচের ইস্কুল খুলেছে। এইবার এ-পাড়ার সুন্দরী মেয়েরা একে একে বিদেশে পাচার হয়ে যাবে।"

"সে আবার কী?"

"জানো না, আজকাল তো এই সবই হয়েছে। গানের স্কুল, নাচের স্কুল সব নারী পাচার চক্র। কাগজ পড়ো না?"

সমঝদার আর একজন বললেন, "ওর রক্তে নারী। ঠাকুরদার অনেক জমিজমা ছিল, সেখানে একটা বেশ্যাপল্লি তৈরি করেছিল। রোজ মাছের মুড়ো খেত। সপ্তাহে একটা করে কচি পাঁঠা।"

"আমি শুনেছি রোজ এক গুলি আফিং-এর সঙ্গে পাঁচ সের দুধ বাঁধা ছিল।"

"এত বড় শিক্ষিত মানুষ। তিনটে সাবজেক্টে এম-এ করেছিলেন।"

"মাতা করেছিলেন, সব জাল সার্টিফিকেট।"

"আজ্ঞে না, ব্রিটিশ আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে জালিয়াতি ঢোকেনি।"

"কে বলেছে, জাল থাকলেই মাছ থাকবে। জেল থাকলেই জালিয়াত থাকবে। স্লোগান হাঁকাও 'জেল হাটাও। জালিয়াত বাঁচাও।' আসল থাকলেই নকল থাকবে। নকলের নকল শুনেছ কোনও দিন।"

'সব যখন নকল হয়ে যাবে?"

"একমাত্র তখনই নকলকে আসল বলা হবে!"

"সব স্ত্রী যদি পরস্ত্রী হয়ে যায়?"

"তখন পরস্ত্রীকেই স্ত্রী বলা হবে।"

"সবাই যদি অপরাধী হয়ে যায়, পুলিসদের কী হবে?"

"সেকি হয়ে যাবে। অপরাধীদের ছুরি ছোরা, ভাঙা বোতল, বন্দুক, বোমা সাপ্লাই করবে। আর চোর চোর খেলবে। টুকি, টুকি।"

"আইনজীবীদের কী হবে?"

"তাঁরা বে হবেন।"

"বে করবেন?"

"না না, বেআইনজীবী হবেন।"

"নকল নোটের কী হবে?"

"হাইব্রিড তৈরি হবে। আসলে নকলে মিলিয়ে। ফলন বাড়বে।"

"নেতাদের কী হবে?"

"ফুটবল খেলতে হবে।"

"সে আবার কী?"

"ইউরো কাপের মতো গণতন্ত্র কাপ। মাঠের একপাশে রাজ্যপাল কোলে নিয়ে বসে থাকবেন। লাল জার্সি, নীল জার্সি, সবুজ জার্সি; বিভিন্ন দল আসবে। লিগের খেলা। সেমিকোয়ার্টার ফাইনাল। যে-দল জিতবে বিধানসভা তাদের হাতে যাবে। রানার্স আপ হবে বিরোধী দল। বিধানসভায় বিল পাস, অমুক পাস, ডিবেট এই সব ছেলেমানুষি থাকবে না। ওটাকে একটা ফাইভস্টার হোটেল করে দেওয়া হবে। গোলকিপার হবেন মুখ্যমন্ত্রী, সেন্টার ফরোয়ার্ড হবেন অর্থমন্ত্রী। ট্যাক্সের বদলে তোলা-সিস্টেম।"

"দেশের মানুষের কী হবে?"

"কী আবার হবে? রোজগার করবে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই। চোর চোরের বাড়িতে, ডাকাত ডাকাতদের বাড়িতে চুরি, ডাকাতি করবে।"

"নারীদের নতুন নাম কী হবে?"

"ট্রাক ড্রাইভার।"

"কেন?"

"স্বামী আর ট্রাকে কোনও তফাত নেই। ট্রাক ডিজেল খায়। স্বামী চা খায়। ট্রাকেরও সেলফ আছে, মানুষেরও সেলফ আছে, ব্যাটারি আছে। ব্যাটারি ডাউন হলে গুচ্ছের কথা শোনালেই চার্জ হয়ে যাবে। ট্রাকের পিছনে যেমন রকম রকম বাণী লেখা থাকে, স্বামীর পিছনেও সেই রকম লেখা থাকবে—বুরি নজরবালে চলে বাজারে।"

বন্ধুগণ শাসনমুক্ত, শিক্ষামুক্ত, সংস্কৃতিমুক্ত, আইনমুক্ত, বিলকুল সব মুক্ত একটা দেশ গঠন করতে হবে। অভয়ারণ্য। মারতে পারলে বাঁচবে, না পারলে হরি হরি বোল। তিনবার হেঁচকি তোল।"

সাপের ছুঁচো গেলা

না, সংসার আমাদের হরেক রকম সমস্যা আর অশান্তি ছাড়া কিছু দেবে না পালাবারও উপায় নেই। এসেছি যখন কোর্স কমপ্লিট করে যেতে হবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমিক মানুষ, মানবদরদী। তিনি বলছেন, 'উট কাঁটাঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে রক্ত দরদর করে পড়ে; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হল, তবু আবার বিয়ে করবে। ছেলে মরে গেল কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল, আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধল, গয়না পরল। এরকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়ে ছেলেও হয়: মোকদ্দমা করে সর্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে! যা ছেলে হয়েছে তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না, ভাল ঘিরে রাখতে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়!

'আবার কখন কখন যেন সাপে ছুঁচো গেল হয়। গিলতেও পারে না, আবার উগরাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয়তো বুঝেছে যে, সংসারে কিছুই আর নাই; আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া। খেলে হয় অম্লশূল।'

সংসারে সুখ? কোথায় সুখ? কিন্তু সংসার ছাড়া মানুষ থাকবে কোথায়!

মানুষ হল পরিবারবদ্ধ জীব। পৃথিবীতে প্রবেশের প্রক্রিয়াটি হল একজন পিতা ও একজন মাতার আন্তরিক প্রয়াস। আনন্দের পথ ধরে দুঃখের পৃথিবীতে প্রবেশ। এই প্রবেশ আর প্রস্থানের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এর পর বাঁচার লড়াইটা একেবারে নিজস্ব। নিজেকে খাওয়াতে হবে পরাতে হবে। মরে যেতে ভয় করবে। কেবলই মনে হবে আরো বাঁচি। এই রকম একটি লোক-কাহিনি আছে—এক কাঠুরিয়া তার মাথার বোঝা নামিয়ে একটা গাছতলায় বসেছে। ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিধ্বস্ত। জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ। হঠাৎ বলে ফেলেছে—ভগবান কবে নেবে! সঙ্গে, সঙ্গে যমদূত এসে হাজির। 'বলো কী জন্যে ডেকেছ।'

কাঠুরিয়া বললে, 'প্রভু! তুমি এই বোঝাটা আমার মাথায় তুলে দাও।'

কবি লিখলেন, 'মরিতে চাহিনা এই সুন্দর ভুবনে!' মানবের মাঝে কবি বাঁচতে চান। সুখে বাঁচব, আনন্দে বাঁচব, শান্তিতে বাঁচব। সুখে বাঁচতে হলে অর্থ চাই। ভোগ ছাড়া সুখ হবে না। আনন্দ মিলবে না। টাকায় সুখ, টাকায় আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রবাদে হোঁচট—অর্থই অনর্থের মূল। গুচ্ছের টাকা, বিষয় সম্পত্তি এক মহা ঝকমারি ব্যাপার। মামলা, মোকর্দমা। কত্তার টাকায় পরিবার-পরিজন ফুর ফুর করে উড়বে। কত্তা কামাবেন, তেনারা ওড়াবেন। চার ছেলে, দুই মেয়ে, দুই জামাই দখলি যুদ্ধে মাথা ফাটাফাটি করবে। কত্তা শেষ শয্যায় শুয়ে মরা মরা চোখে মজা দেখবেন। সে-সব গল্প অনেক আছে। বিষয় বিষ? না বিষয় মধু? বহুত সংশয়। থাকলেও জ্বালা, না থাকলেও জ্বালা।

আদি এবং অকৃত্রিম সমস্যা হল, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। মধুর হলে কেয়াবাত। শর্ট সার্কিট হয়ে গেলেই সর্বনাশ। সুখী গৃহকোণে বাজে প্রেমের গ্রামোফোন। অসুখী গৃহমণ্ডলে কাড়ানাকাড়া। ওই ছড়াটাকে একটু মুচড়ে নি,

বাজতে বাজতে চলল ডুলি
ডুলি যাবে সেই শ্মশানপুরী
চিতায় চড়লেই কেয়া শান্তি।
ব্যাট আছে বল নেই
কথা আছে উত্তর নেই
চারি দিক শুনশান
হাওয়া বয় শন শন।

স্বামীকেই 'অ্যাডজাস্ট' করতে হবে। নেচে নেচে বিয়ে তিনিই করতে যান। তিনি

'ক্যামেরা', স্ত্রী হলেন 'র-স্টক', ফিল্ম। সেই ফিতেতে ফটাফট ছবি উঠবে। শাটার ঝিলিক মারবে।

॥ গৃহশান্তির প্রথম পাঠ ॥

পরিবার কী কী কারণে রাগেন? মনে রাখতে হবে, স্ত্রী প্রভুর সমান। সব স্বামীই 'অন হার ম্যাজিস্টিস সার্ভিসে' বেঁচে বর্তে থাকে। এ বড় মধুর দাসত্ব। অতএব কাজে ফাঁকি দিলে, অবাধ্য হলে, 'মধুর বাক্যবাণে জর্জরিত হবে তুমি স্বামী'। স্ত্রীর তূণে কী কী বাক্যবাণ থাকতে পারে।

১।। দ্যাখো, দেখে শেখো। অরুণার স্বামী সব কাজ করে। আর তুমি? এক গেলাস জল গড়িয়ে খাওয়ারও মুরোদ নেই।

২।। তোমার মতো অপদার্থ দুনিয়ায় দুটো নেই। অমন একটা চান্স ছেড়ে দিলে?

৩।। কুম্ভকর্ণের দ্বিতীয় এডিশান। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই জীবন শেষ।

৪।। আর কবে বুঝবে নিজের আখের? নিজের গায়ে তেল না ডাল, মিত্তির সায়েবের পায়ে কয়েক ফোঁটা লাগাও। সবাইয়ের সব কিছু হয়ে গেল, ইনি শুধু বাণী দিয়েই জীবন কাটালেন। বচনের ঝুড়ি। মুখেন মারিতং জগৎ।

৫।। মাথা-মোটার বংশ।

৬।। কাজের মধ্যে দুই—খাই আর শুই।

৭।। থাক, আমার কথা দয়া করে তোমাকে আর ভাবতে হবে না। স্বার্থপরের বংশ। ছেলে স্বার্থপর, বাপ স্বার্থপর, মা স্বার্থপর, চোদ্দোপুরুষ স্বার্থপর, যেটা এসেছে সেটাও স্বার্থপর। এই বাড়ির ইট, কাঠ, পাথর, ঝ্যাঁটা-জুতো সব স্বার্থপর।

৮।। বেইমানের ঝাড়।

৯।। আমার জন্যে তুমি কী করেছ? কী ঘোড়ার ডিম তুমি করেছ? সারাটা জীবন কেবল ধামসেছ। পড়তে অন্য কোনো মেয়ের পাল্লায়, বাপের নাম ভুলিয়ে দিত।

১০।। অশান্তি ছাড়া তুমি আর কী করতে শিখেছ? আর কী শেখানো হয়েছে?

১১।। আমার বাপের বাড়ি? তাদের নখের যুগ্যি হতে পারবে কোনো দিন!

১২।। তুমি ভাল তো আমি ভাল। জগৎ হল আয়নার মুখ দেখা।

॥ নির্দেশ ॥

নীরবতা। স্পকটি নট। যে চোটপাট উত্তর না দিয়ে গুম মেরে থাকে সেই জ্ঞানী। বিচক্ষণ মানুষ রাগেন না। রাগলেই পয়েন্ট কাটা যায়। গৃহসুখ, গৃহশান্তির প্রথম পাঠ হল,

স্ত্রীর মুখে মুখে তর্ক না করা। দাঁতে দাঁত চেপে
নিজের রাগকে সংযত রাখা। কথা আর রাগ হল

কুরুক্ষেত্রের মশলা। ধনে, জিরে, পাঁচফোড়ন।

বলেছ কি মরেছ।

ইংরেজের ইংরিজি উপদেশ, যে দেশে বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথেই ডিভোর্স। ভাঙচুর যাতে না হয় তার জন্যে উপদেষ্টাদের চেতোয়ানি।

He who spares his words has true wisdom
And he who holds his temper is a man of sense.

যে সহনশীল, যার সহ্যশক্তি বেশি, সে যে কোনও যোদ্ধার চেয়ে শক্তিশালী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীদের দিকে এই মোক্ষম উপদেশটি ছুড়ে দিয়েছেন—শ, ষ, স, সহ্য কর, সহ্য, সহ্য কর। যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।

॥ দ্বিতীয় পাঠ ॥

'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' এই যখন কথা, তখন তাঁর মর্জিতেই কর্তাদের লেফট্ রাইট। ওই যেমন আছে—হোতা হায় ওহি যে মঞ্জুরে খোদা। সেই রকম যো মঞ্জুরে ওয়াইফ। ইংরিজিতে আছে—কিপ হার ইন গুড হিউমার। দেবীর সংসারে পুরুষ, তুমি এক নিষ্ঠাবান সেবক মাত্র। মৌচাক টেকনিক। কুইন বি আর ওয়ার্কার বি। কর্তব্য আর কর্ম।

১। সকালে যথাসময়ে বাজার। ফর্দ তাঁর, পয়সা তোমার।

২। চাহিদা মতন ফুয়েলের জোগান, গ্যাস ও কেরোসিন।

৩। এতটুকু বিরক্ত না হয়ে, হাসিমুখে ফাইফরমাশ খাটা—ফরামাইয়ে জি!

৪। যখন যেখানে যেতে বলবেন বিনা প্রতিবাদে যাওয়া এবং নিয়ে যাওয়া।

৫। বারে বারে চা না চাওয়া। চায়ের কাপেই শান্তি, অশান্তি। স্টর্ম ইন এ টি কাপ। খুবই শোনা কথা। ভোরের প্রথম কাপ হাসি মুখে তাঁর ঠোঁটের ডগায় নিজে হাতে ধরে দিতে পারলে—কেয়া বাত! যেন ভোরের মিষ্ট রোদ এক চিলতে জানলা গলে গড়িয়ে এল জীবনে। রথের মেলার পাতলা কুড়মুড়ে পাঁপরে ভাজা। জীবনের কদম গাছে প্রথম কদম ফুল। দেখতে হবে, সাবধান হতে হবে, প্রথম প্রেম যেন শুকিয়ে না যায়!

৬। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি নিয়ে যাওয়া উচিত, সে যত দূরেই হোক। স্ত্রীর পক্ষে এটি হবে 'ব্রেদার'। জন্মকালীন পরিবেশে ফিরে এসে শৈশবকে ফিরে পাওয়া। শুধু তাই নয়, তিনি বুঝতেও পারবেন, বিয়ের পর বাপের বাড়িতে মেয়েদের অবস্থান ভাসমান। সব ভ্রমণই শিক্ষামূলক।

৭। রাতে বিছানা করা, মশারি টাঙানো, সকালে পরিপাটি করে তোলা। এটি একটি সেবামূলক কাজ। দেবীজ্ঞানে স্ত্রী সেবা।

৮। কাজের লোক না এলে বাসনমাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করা। একে বলে কমরেডশিপ'।

৯। রাতে শুতে যাওয়ার আগে দরজা বন্ধ করা, সব আলো নেবানো আর ভোরে কাজের লোককে খুলে দেওয়া।

১০। স্ত্রীর দিকে সদা সর্বদা একটি হাসি হাসি মুখ তুলে ধরে রাখা।

এই হল 'গৃহ-শান্তি'র টেন কমান্ডমেন্টস।

॥ তৃতীয় পাঠ ॥

বেলা পড়ে এল। জীবনের বেলা। 'আয়ুসূর্য বসিতেছে পাটে।' আর কি, 'এখন আমার সময় হল, যাবার দুয়ার খোলো।' এই পড়ন্ত বেলায় মনে হতে পারে, কয়েকটা বছর মহানন্দে কাটাই না কেন। ভোরে বেড়াতে যাব ছড়ি হাতে। সাদা পোশাক। স্নেহময়ী, মমতাময়ী পুত্রবধূ কিনে দিয়েছে নরম কার্ডিগান। বেরোবার আগে সুন্দর ফিনফিনে কাপে চা। ফিরে এসে আবার এক কাপ সুখ-সুখ চা। চোখের সামনে মেলে ধরা খবরের কাগজ। মাঝে মাঝে বলা, না দেশটা উচ্ছন্নে গেছে। টিভি খুলে ধর্মকথা শোনা। পৃথিবীতে কত কথাই যে আছে। পুত্রবধূ এসে বলবে, 'স্নানে যাওয়ার আগে বলবেন পিঠটায় একটু তেল মাখিয়ে দেবো।'

একেবারেই না, এই সব স্বপ্ন দুঃখের কারণ। শীতল বার্ধক্য। ধূসর দৃষ্টি। কোই হ্যায়? কোই নেহি হ্যায়। বহু দূরে কেউ আসছে। ধীরে, মৃদু চরণে। অতি, অতি প্রাচীন কেউ! জানি কে আসছে। তা হলে? তাহলে শেষ পাঠ—ভিজে তোয়ালের মতো দিনের তারে ঝুলে থাকো। জেনে রাখো, কেউ মুখ মুছবে, কেউ মুছবে না।

চাওমিন আর চিলি চিকেন

'তারপর কী হল ভাই? আমার কথাটি ফুরলো, নটে গাছটি মুড়লো।'

'অত সহজ নয়। বিয়ের গাছ সহজে মুড়োয় না। ও তোমার তিনতলার ছাতের কার্নিসের বেপট জায়গায় একটি বটগাছ। যেখানে পৌঁছবার ক্ষমতা নেই। স্রেফ দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে দেখে যাও। নিচে দাঁড়িয়ে। বাড়ছে-বাড়ছে। বাড়ির গা বেয়ে শেকড় নামছে, নামছে। বটের বাড়াবাড়ি দেখে যাও। এক্সপার্ট এসে বলবে, সর্বনাশ! এ ত শেকড় নামিয়ে দিয়েছে! উপায়? একটাই উপায়, বাড়ি ধসিয়ে দাও।'

'তাহলে চাওমিন আর চিলির যে বিয়ে হল, প্রেমের বিয়ে, শেষ পযন্ত হলটা কী?'

'প্রেমের ঠোঁটে করে বীজ এনেছিল একটি। বউ যে বীজ সেটি বোঝ কি? অশান্তির বীজ। সৃষ্টির বীজ। বউ মানে কী? শুদ্ধ বাংলায় বধূ। ধু-ধু। ধু-ধু করে জ্বলল আগুন, পুড়ছে বেগুন। শেষে ধু-ধু মরুভূমি। বালি আর বালি। কুঁজঅলা একটা উট বালির ঝনের মধ্যে দিয়ে ছুটছে দিশাহারা। পিঠে একটা 'সলিড' বোঝা। হরেক রকম পোঁটলা-পুঁটলি। সেটি তোমার কেরামতির সংসার। সন্তান-সন্ততি। উট চলেছে মুখটি তুলে/পিঠে তাহার বধূ বসে/পোঁটলা-পুঁটলি হরেক রকম/বধূর ওই ধূ-শব্দটি

সর ধূসর করে দেয়। জীবনানন্দকে মনে পড়ে?'

'আমার প্রিয় কবি। কলেজ জীবন তাঁকে নিয়েই কেটেছে।'

'সেই দুটো লাইন, অপরূপ মদ খেয়ে মুখ মুছে নিয়ে। পুনরায় তুলে নেয় অপূর্ব গেলাস।

'তা হলে ওই জায়গাটা বলি, বয়েস তোমার কত? চল্লিশ বছর হল?/প্রণয়ের পালা ঢের এল গেল/হল না মিলন?'

'শোনো, চাওমিনের অবস্থাটা কেমন হল শোনো, চিলির চিলি ক্রমশ বাড়তে লাগল।

ক্যানেস্তারা পিটিয়ে যুদ্ধের গান গাইতে লাগল, স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিয়ে চায়/ দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়! চাওমিন বিলিতি ঢঙে মিষ্টি করে বোঝাতে গেল,

'হানি! তুমি এই রকম ব্যবহার করছ কেন ডারলিং। জিনিসপত্র নির্বিচারে এধারে ওধারে হারলিং। প্রেমের সময় আমার হাতে হাত রেখে কেমন গাইতে, আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা রচিব গো ধরণীতে। এখন আমাকে দেখলেই গুঁতোতে আস।'

'তুমি তোমার বাপ-মায়ের গোলাম। আমি গোলামি সহ্য করতে পারি না।'

'কী আশ্চর্য! বাপ-মাকে আমি ছাড়ি কী করে?'

'ও আমি ছাড়তে পারি, তুমি ছাড়তে পার না। নিজের বেলায় আঁটি-সুটি, পরের বেলায় দাঁতকপাটি!'

চাওমিন ভীষণ রেগে গিয়ে বললে, 'গো টু হেল।'

চিলি ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে বাড়ি চলে গেল। পরের পরের দিন রাত বারোটার সময় পুলিস এসে কোমরে দড়ি বেঁধে চাওমিনকে তুলে নিয়ে গেল। পুরে দিল ফাটকে। জিজ্ঞেস করল, কী অপরাধ স্যার? বড়বাবু বললেন, ফোর নাইনটি এইট-এ।'

'ফোর টোয়েন্টি জানি। ওটা আবার কী?'

'বিয়ে করলে জানতে পারবে। ওটি হল মৌমাছির হুল। হুলিয়া। প্রবাদ আছে না! ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি! চিলি চিকেন ব্লেড দিয়ে শরীরের কয়েক জায়গা ফালাফালা করে সোজা চলে গেল থানায়। বধূ নির্যাতনের অভিযোগ। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি পালা করে পিটিয়েছে। ফিজিক্যাল ইনজুরি। মেয়ে ছেলেকে শাসিয়েছে— তোমাকে আমি ঘানি ঘোরা করব। এখন ডিভোর্স মামলা শুরু হয়েছে দু-পক্ষের উকিল সপরিবারে দমভোর চিলিচিকেন আর চাওমিন খাচ্ছে।'

'কেলেঙ্কারি কেস। ছেলেটি আবার প্রেম করবে? বিয়ে করবে আবার?'

'শোনো, প্রেম আর ম্যালেরিয়া একই রকমের ভাইরাস। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। কুইনিন দিলে জ্বর ছাড়ে। কয়েকদিন পরে আবার আসে। সারা জীবনের সঙ্গী এই

কাঁপুনি।'

'কাঁপুনি! বাঃ ভাল বললে ভাই। দেখ, পঁচিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলুম। এখন বয়েস হল যাট। এই পঁয়ত্রিশটি বছর আমি কাঁপছি। জ্বরে নয়। বউয়ের ভয়ে। সারাটা জীবনই ত পরাধীন। প্রথম জীবনে পরীক্ষার ভয়। তারপর ছাঁদনাতলায় গিয়ে আজীবন পরাধীনতার অঙ্গীকার। উঠতে খোঁচা, বসতে খোঁচা। ব্লাড সার্কুলেশন ভালই হচ্ছে। ফুলশয্যায় শুরু, শরশয্যায় শেষ। ভীষ্মদেব ত বিবাহ করেননি।'

'না, চিরকুমার।'

'তিনি বৃদ্ধ বয়সে, মৃত্যুর আগে বিয়ে করেছিলেন।'

'তুমি গুলিয়ে ফেলেছ। মৃত্যুর আগে বিয়ে করেছিলেন হিটলার।'

'শোনো, ভীষ্মের ওই শরশয্যায় শুয়ে পড়াটাই হল বিবাহ।'

'তা বলতে পার। ঘরে ঘরে ভীষ্ম। শরশয্যায় চিৎপাত।'

'বিয়ে না করলে কী হয়?'

'এডস হয়। বিয়ে তো মানুষ করে না, বিয়ে করতে বাধ্য করায় তিনটে 'কেমিক্যাল'। অক্সিটোসিন, ভেসোপ্রেসিন, আর ডোপামিন। দুটো ইংরিজি শব্দ আছে, 'লাস্ট' আর 'লাভ'। কাম আর প্রেম। 'ব্রেনে' অক্সিটোসিন আর ভেসোপ্রেসিন-এর মাত্রা বাড়লে প্রেম আসে। প্রেমের বন্ধন পাকা বন্ধন—টিল ডেথ ডু আস অ্যাপার্ট। প্রেমিকের মনে হল, এই নারী অপরূপ, বাসনার মতো ভালবাসা খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতেরে তার।
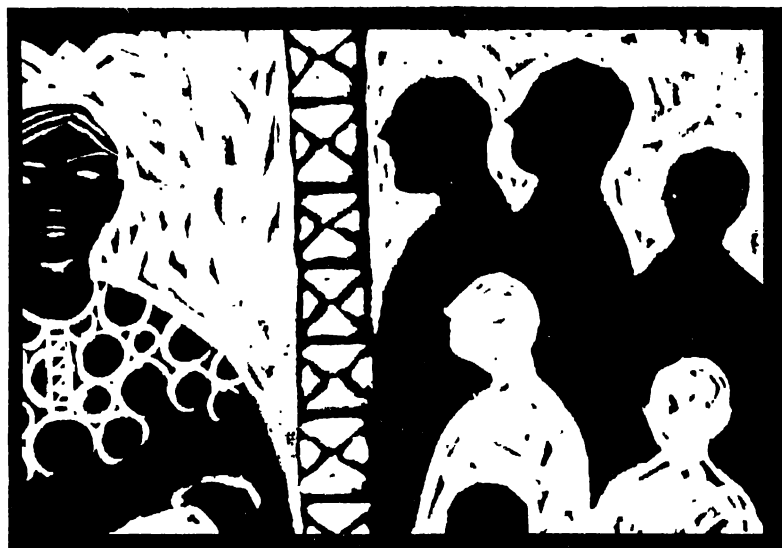
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ

'তারপর কী হল ভাই?'

'কীসের কী হল?'

'এই যে সেদিন বিয়ের গল্প কইছিলে? চাওমিনের সঙ্গে চিলি চিকেনের বিয়া?'

'সাতশো টাকা ভূতায় নম হয়ে গেল আমার।'

'তোমার টাকা?'

'ইয়েস! শুধু আমার নয় অনেকের। প্রায় পাঁচশো লোকের। খালি হাতে তো নেমুন্তন্য খাওয়া যায় না। প্রত্যেককেই কিছু না কিছু নিয়ে যেতে হয়। অ্যাভারেজ পাঁচশো ইনটু পাঁচশো করলে কত হয়?'

'আড়াই লাখ।'

'তাহলে আড়াই লাখ ভূতায় নম।'

'ভূত এল কোত্থেকে!'

'অপঘাতে মানুষ মরলে ভূত হয়। অপঘাতে বিয়ে মরলে জোড়া ভূত হয়। চিলি চিকেনের চিলি বেড়ে গেল। পরিবার পরিজন অতিষ্ঠ। মধুযামিনীতে বাজতে লাগল কাড়ানাকাড়া। বাড়িতে একটাও কাচের গেলাস, কাপডিশ রইল না। সব স্টিল। সে কি টেনশন রে ভাই! কে থাকে কে যায়। চিলির চিল চিৎকার। তোমার ওই বুনো জরদগব বাপ, আর ওই খেঁকুরে মা-টাকে নিয়ে এক ছাতের তলায় পা-র-ছি-না-পারবো

না। ইনকিলাব জিন্দাবাদ? চাওমিন জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাবে? চিলি বললে, জাহান্নামে। চিলি বললে, এ-বাড়িতে চিলি থাকবে, আর থাকবে তার চিকেনরা।

'এইবার সেকেন্ডফ্রন্ট খুলে গেল। চিলির মা যখন-তখন এসে কলকাঠি নাড়তে লাগলেন। জামাইকে বলতে লাগলেন, বাবা চাউ, বিয়ের পর ছেলেদের বাপ, মা বদলে যায় বাবা। এখন আমরাই তোমার সব। তোমার 'গভ্যধারিণী' হল ঝি, আর তোমার বাপ হল দরোয়ান। সেই শ্রাদ্ধের সময় একটু ঘটা করে দিও। তখন বার কতক পিতা স্বর্গ বোলো। আহা! যতই হোক জনক-জননী তো! বেশি আদর দিয়ে পরমায়ু বাড়িয়ে দিও না বাবা! ছেলের সংসারে দীর্ঘদিন পড়ে থাকা পাপ। শীতায় শ্রীভগবান বারে বারে বলেছেন। বলেছেন, মা ফলেষু কদাচন। এ-কথা তিনি কেন বলছেন? কাকে বলছেন? বলছেন অর্জুনকে। অর্জুন কে? অর্জুন গাছ। বৃন্দাবনের আমবাগানে গাছভর্তি বৃন্দাবনী ল্যাংড়া আম। আম যেই পাকল বারো ভূতে পেড়ে নিয়ে চলে গেল। অতএব, ফলের আশা কোরো না। তোমার 'বাপগাছের' ফল তুমি। তোমার বাপকে গিয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলো, বাবা, মা ফলেষু কদাচন।

'এইবার দুই শাশুড়িতে শুরু হয়ে গেল দক্ষযজ্ঞ। ছেলের মা মেয়ের মাকে বলছেন, যেমন মা তার তেমন মেয়ে। আর মেয়ের মা ছেলের মাকে স্বামী তুলে গালাগাল দিয়ে বলছেন, আহা হা! ওই তো ছেলের ছিরি—অঘাসুরের ব্যাটা বকাসুর। এইবার মজাটা হল, দুই বেয়াই কিন্তু ভীষণ ভাব। পার্কে বসে হা-হুতাশ। কারণ, মেয়ের বাপের ছেলে প্রেমিকাকে রেজিস্ট্রি করে নিয়ে এসেছে। সেই বউও একই খেলা দেখাচ্ছে। বরের বাপকে পথে না বসিয়ে পার্কে বসিয়েছে। উটকো বেড়াল স্বভাবে গেরস্তবাড়িতে ঢোকে, সেই ভাবে চুপিচুপি ঢোকার চেষ্টা করেন। তার পরেই তাড়া খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। সামনে পরিচিত কেউ পড়লে, অযাচিত ভাবে একগাল হেসে বলেন, 'ভাল আছেন?' তিনি হয়ত জিজ্ঞেস করলেন, 'এই অসময়ে কড়কড়ে রোদে চলেছেন কোথায়?' আরো হেসে বললেন, 'আর বলবেন না, আমার হয়েছে মহা জ্বালা। স্নেহ অতি বিষম বস্তু। আমার বউমার হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছে, বুড়োকে পুঁটি মাছের ঝাল খাওয়াবে। ওই যে কথায় কথায় একবার বলে ফেলেছি, মেয়ে অমনি কোমরে আঁচল জড়িয়ে বললে, তবে এক্ষুণি হয়ে যাক। বুড়ো মানুষ! কখন কী হয়ে যায়, কে বলতে পারে। শেষে কি সামান্য পুঁটি মাছের জন্যে মৃত হয়ে ঘাড় মটকাবে!' ভদ্রলোক বললেন, 'বাজার তো উঠে গেছে। পুঁটি ভোরে আসে!' তারপর বললেন, 'আপনার ভাগ্য দেখে হিংসে হচ্ছে।'

প্রায় দুপুর। রাস্তাঘাট মোটামুটি ফাঁকা। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ বাহন একটা দুটো অটো কাঁপতে কাঁপতে চলে যাচ্ছে। একালের সিম্বল। অনেকটা শেকড়হীন সংসারের মতো। চারটে ফ্যালফ্যালে লোক ভেতরে বসে আছে। পরিবারে শাসন নেই, শরীরেও শাসন নেই। প্রত্যেকরই কোলে দশমাসের একটি ভুঁড়ি। তাতা থই থই,

তাতা থই থই। আর অটোর ইঞ্জিনের আওয়াজ—যেন হাঁড়ির ভেতর একসঙ্গে আটট ট্যাংরা মাছ ভাজা হচ্ছে। চলমান তাঁবু। এদিকে হাঁটু বেরিয়ে আছে, ওদিকে কনুই মা-কালীর হাতের কাটা মুণ্ডুর মতো একটা মাথা দুলছে, ঝুলছে।

একপাশে দাঁড়িয়ে দুই প্রবীণ।

পুঁটি মাছ বললেন, 'হিংসের কারণ?'

'আপনার বউমা আপনাকে পুঁটিমাছের ঝাল খাওয়াবে, আর আমার বউমা নোটিস দিয়েছে, একমাসের মধ্যে হয় সরো, না হয় মরো!'

পুঁটি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ঠিক করলেন?'

'মরাটা তো আমার হাতে নেই, সরার চেষ্টাই করতে হবে।'

'আমাকে সঙ্গে নেবেন!'

'সে কী? আপনার এত সুখ! বেলা বারোটায় পুঁটি ধরতে যাচ্ছেন!'

'তাহলে বলি শুনুন, গল্প করতে করতে একজন আর একজনকে বলছে, জানি আমার মামারা কত বড়লোক! তাদের এক গোয়াল ঘোড়া আছে। যাকে বলছে সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল, তার মামার গরুও নেই, ঘোড়াও নেই। আসুন, কোরাসে গাই—

'We are on the same boat brother'

আরে ভাই, সেই চাওমিন, চিলি চিকেনের কী হল?

বলব, বলব।

চিলির সঙ্গে চিকেন

প্রথমে দেখা হল। তারপর প্রাণ আঁকুপাঁকু। তারপর দেখাদেখি, ঘোরাঘুরি। মাইলের পর মাইল কথা। অর্থহীন হাসাহাসি। হাত ধরাধরি! নাকানাকি। বেড়াবেড়ি। তারপর বিয়ে। গুচ্ছের লোকের গুঁতোগুঁতি। কেউ আনল ফোল্ডিং ছাতা, কেউ শাড়ি, কেউ ননস্টিক প্যান, কেউ এক পয়সা সোনার নাক ছাবি।

ভাড়া-করা বিয়েবাড়িতে প্রবল হুল্লোড়। বাক্‌সে চাপা সুরে গান। ক্যাটারারের উর্দি-পরা কর্মীর দল সেই ভিড়ে উল-বোনা কাঁটার মতো মানুষের ফাঁসেব মধ্যে দিয়ে অক্লেশে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। যখনই প্রয়োজন হচ্ছে হাতের ট্রে মাথার ওপর তুলে মাথার পর মাথা 'পাস' করাচ্ছে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটছে না।

মেয়েদের ঠোঁট দগদগে লাল। মোমপালিশ মুখ। খড়খড়ে শাড়ি, লেপ্টে থাকা শাড়ি, অদৃশ্য শাড়ি। ব্লাউজের নানা ধরন। কোনোটার পিঠের দিকটা, 'স্মৃতিটুকু থাক'। কোন অতলে তার সীমারেখা পরিহিতাই জানেন। কোনো ব্লাউজ সামনের দিকে এতটাই দুঃসাহসী যে, পুরুষদের মাথা 'সিগন্যাল ডাউন'। দৃষ্টির রেলগাড়ি পা ছুঁয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

একালের শিশুরা টি.ভির-র কৃপায় অতি-পক্ক। বাপ-মাকেই জ্ঞান নিতে হয়। এমন সব পোশাক পরেছে, যা সেকালের পাগল, পাগলিরাই পরত। এখন ছেলে, মেয়েরা খুব আদরে থাকে। ইউনিট-ফ্যামিলি। সন্তান সংখ্যা কম। একটা কি দুটো।

ফলে চেহারা সব ফুটবলের মতো। সেই চেহারায় মেয়েদের পরিধানে টাইট পোশাক। এর আবার সব নাম আছে। আমেরিকা থেকে বোম্বাই, বোম্বাই থেকে কলকাতা। এইরকম সব নাম, 'হিপ-হাগিং', 'ব্রেস্ট প্রোমোটিং'। এক কিশোরী পাজামার মতো কী একটা পরেছে। তলার দিকটা ফালা ফালা করে কাটা। যেন কেউ চিরে দিয়েছে। এটা হল বটম, আর টপটা হল, সিল্কের স্যান্ডো গেঞ্জি। এই পোশাকের নাম হল, 'ক্লাউন কাট'। এই সিরিজে আর একটা ধরন আছে 'আন্ডার কাট।' সেটা কী ফ্যাশান, যাঁরা জানেন তাঁরাই জানেন। মাছ যেমন জলে সাঁতার কাটে সেই ভাবে এই মানব-পুকুরে তারা ঘাই মেরে বেড়াচ্ছে। উঠতি বয়সের ছেলে আর মেয়েরা আগামী বিবাহের মহড়া দিচ্ছে। প্রবীণ-প্রবীণারা দেখেও দেখছেন না। যুগ একেবারে কেলেঙ্কারি রকমের বদলে গেছে। কেউ কারো কথা শুনছে না বলে, কেউই কারোকে কিছু বলছে না। সবাই ড্যাবা ড্যাবা চোখে। জগতের গ্যালারিতে বসে জীবনের তামাসা দেখছে।

কেউ হয়ত এই রকম বলছেন, 'ওটা কার মেয়ে?'

'আমাদের প্রমোদের মেয়ে।'

'অ্যাঁ! এতটা এগিয়েছে?'

'মেয়েরা ভীষণ স্পিডে এগোচ্ছে ভাই।'

'কোন দিকে?'

'সে আমি বলতে পারব না।'

'ওই কালো পাঞ্জাবি পরা ছেলেটা কে? খব লপচপ করছে।'

'চিনতে পারছ না, মনোজের ছেলে! টেলি-সিরিয়ালে অভিনয় করে।

'ওই সিরিয়ালটা তুমি দেখ না?'

'কোনটা?'

'এক আকাশে অনেক তারা। পাঁচ বছর ধরে চলছে। আমার মেয়ের বিয়ে হল, নাতি হল, সে স্কুলে ভর্তি হল, এখনও চলছে।'

'চলবেই তো! আকাশে কত তারা আছে জান? তা চুলগুলো অমন ঝুলঝাড়ুর মতো হয়ে আছে কেন?'

'ওটা লেটেস্ট। টম হ্যাঙ্ক কাট।'

'সে আবার কী, আমাদের সময় ছিল ইটালিয়ান কাট।'

'টম হ্যাঙ্ক একজন বিলিতি স্টার। ও তাকে নকল করছে।'

'আসল হতে আপত্তি কী?'

'কাটবে না। গানের রিমেকের মতো। লতা কণ্ঠী, কিশোর কণ্ঠ।'

'সব দু'নম্বরি।'

এরই মধ্যে একজনের উৎপাতে সকলেই অতিষ্ঠ। তিনি একটা ভিডিও ক্যামেরা

য়ে যার তার ঘাড়ে পড়ছেন। হঠাৎ গোরগোল, 'গেল, গেল, গেল, গেল, বিনা সির পরচুল খুলে নিয়ে গেল।'

ক্যামেরার তারে জড়িয়ে পরচুল উৎপাটিত। করুণ মাথার চেয়ে ভদ্রমহিলার চ্ছবি আরো করুণ।

'কী ছবি তুলছে বল তো! ঘুরে ঘুরে সেই একই দৃশ্য। ফালু মাসি এতখানি হাঁ রে মুখে পানের খিলি পুরছে। মহিলাসক্ত জগাদা মেয়েদের সঙ্গে ফাজলামো রছে। তারের চেয়ারে ফুলের গয়না পরে নববধূ সেঁটে বসে আছে। মাথার চুলে জনীগন্ধার পোকা ঘুর ঘুর করছে। বধূ সাজানোর কোম্পানি ঝাড়া চারঘণ্টা ধরে জিয়েছে। চুলে শ্যাম্পু মেরেছে তিনবার। ফল বেরোচ্ছে। ফিঁচিৎ, ফিঁচিৎ, হাঁচি। বড় উতলা হয়েছেন। বন্ধুদের ছোটাছুটি—অ্যান্টি অ্যালার্জিকের তল্লাসে।

একজন অভিজ্ঞ বললেন, 'ডোন্ট ডু দ্যাট, ডোন্ট ডু দ্যাট, বউ ঘুমিয়ে পড়বে। চতে দাও। কাশি হলে দেখা যাবে।'

'ছেলেটি কী করে জানো? বউ মেন্টেন করতে পারবে তো?'

'আজকালকার ছেলেরা কী করে বোঝা মুশকিল! আমাদের কালে বলা যেত। নেছি চাওমিন কাউন্টার আছে। খুব বিক্রি। মেয়েটি খদ্দের ছিল। প্রেম হল, পাকল, য়ে হল। কাউন্টারের রাস্তার দিক থেকে ভেতরের দিকে চলে এল।'

'সে ভাল। এইবার চিলি চিকেনও বিক্রি হবে। একেই বলে, জীবনের সস। সুইট ্যান্ড সাওয়ার।'

থিম

'বলো, কেমন ঘুরেটুরে এলে? দেশটার ছিরিটিরি কিছু ফিরেছে?'

'না গো, তেমন কিছু বুঝলুম না, সেই একই বেহাল অবস্থা। বঙ্গবাসীর দাঁতে গর্ত, লম্বা লম্বা রাস্তাতেও গর্ত। দু দিকেই ফিলিং-এর ব্যবস্থা। দাঁত তবু তেমন বুঝ তুলে ফেলে দেওয়া যায়, রাস্তা তো আর তুলে ফেলা যায় না!'

'রাস্তার কথা ছাড়। রাস্তার সঙ্গে তোমার কতটুকু সম্পর্ক! তুমি তো আকাশপ মেঘের ভেলায় চেপে যাবে আর জলপথে সাঁতার কেটে ফিরে আসবে। এমনি কে খাতিরটাতির করলে?'

'আমি তো নেই গো মহেশ্বর, আমি সেখানে 'থিম' হয়ে গেছি।'

'কী শুনতে কী শুনে এলে! থিম আবার কী? বলো হিম, তুমি তো হৈমবতী

'আজ্ঞে না, ঠিকই শুনেছি। থিম-পুজো। থিম মানে জানো? থিম মানে ভা বড় বড় আর্টিস্টরা আমার ভাবটাকে তাদের ভাবনায় নিয়ে গিয়ে আমার এক এক মূর্তি গড়েছে। আমি একটা মূর্তিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'এই তুই কে?' বললে, 'জ না, আর্টিস্ট জানে, তবে বলছে দুর্গা। লোহার দুর্গা। লোহার রড, নাট, বল্টু দি তৈরি করেছে।'

'অনেক আগেই তোমাকে সাবধান করেছিলুম, অত পপুলার হতে যেয়ো ন

ক্তদের পাল্লায় পড়ে মরবে।'

'ভক্ত কোথায় গো! এখন তো আমি ব্যবসা। দুর্গা-ব্যবসা। ফার্স্ট, সেকেন্ড হচ্ছে। কা উড়ছে ফড়্ ফড়্ করে। কোথাও আমি নাগা-রমণী, কোথাও আমি রাজস্থানি চনেওয়ালী।'

'মহিষাসুরের কোমর জড়িয়ে ধরে নাচছ।'

'এখনো নাচিনি, তবে মনে হচ্ছে নাচাবে। এক জায়গায় ওরা মহিষাসুরকে খাড়া রে দিয়েছে। সে আর পায়ের তলায় নেই।'

'এরপর তোমার সিংহটিও যাবে।'

'কেন?'

'যে আইনে সার্কাস থেকে বাঘ গেছে, সেই আইনেই তোমার পায়ের তলা থেকে সংহটিও সরবে।'

'তা হলে আমি দাঁড়াব কোথায়?'

'আমার বুকে।'

'মহেশ্বর, তোমার বুকে দাঁড়ালে যে আমি কালী হয়ে যাবে।'

'আমার বুকে দাঁড়ালে তুমি বেঁচে যাবে। কালীকে নিয়ে বেশি কেরামতি করা য় না। ওই রূপের যা ছিরি। সামনে এতখানি জিভ ঝুলছে। হাতে কাটা মুণ্ডু।'

'একটা কথা শুনে এলুম। সাংঘাতিক। কালীর লকলকে জিভে বিজ্ঞাপন লাগাবে।'

'কে লাগাবে?'

'যারা পানীয় তৈরি করে। সফ্‌ট ড্রিংকস, হার্ড ড্রিংকস। আর ওই কাটা মুণ্ডু! টা না কি একটা দারুণ স্পট! ওটা নেবে, যারা গয়না তৈরি করে তারা। লিখে বে, 'ধড়ে মাথাটা যদি ধরে রাখতে চান, কিনে দিন মুক্তো মালা। বিপত্তারিণী ার্লস।' আর তোমাকে যা করবে, ভাবতেও পারবে না।'

'কী শুনি?'

'সাপের ফণায় লেখা থাকবে, এডসের ছোবল থেকে সাবধান। আর লিখবে, াবা জাঙ্গিয়া' মহাদেবও পরেন। নরম, মোলায়েম, টেঁকসই।

বাবুদের বাড়াবাড়ি

পুজোর ডামাডোল এবছরের মতো মোটামুটি শেষ হল। ভিটেমাটি চাঁটি হল। ে
কগাছা চুল ছিল মাথায় তার আদ্দেক ঝরে গেল। নানা রকমের অচেনা, অজা
খাবার উদরে প্রবেশ করে প্রভূত অশান্তির কারণ হল। বলে গেল, টেঁসে যদি
যাও আসছে বছর আবার হবে।

সে বটে পুজো ছিল—কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্রের দুর্গাপুজো। সে এক এলা
ব্যাপার; যেন গল্পকথা! এই মিত্তির পরিবার পুজোর ধুমধাম করেই সর্বস্বা:
মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পলাশীর যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন। সাত তাড়াতা
রাজবাড়ির উত্তর দিকটা তৈরি করালেন। অবাক হয়ে যাওয়ার মতো কম সমে
কেন? না, দুর্গাপুজো হবে। পুজোর উদ্বোধন হল বাইনাচ দিয়ে। বড় বড় সাহেব
নিমন্ত্রিত। পুজোর চেয়ে নাচের আকর্ষণ বেশি। সাহেবরা এই নৃত্যোৎসবা
পলাশীযুদ্ধজয়ের স্মৃতি উৎসব বলে সাগ্রহে যোগদান করতেন।

কালীশঙ্কর ঘোষের বাড়ির কালীপুজো ছিল এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এঁরা ছিলে
চোপার ঘোষ। ঘোর তান্ত্রিক! সুরাপান ভিন্ন আহ্নিক সম্পন্ন হয় না। বাড়ির গু
পুরোহিত, কর্তা এবং যত পুরুষ প্রত্যেককে সুরাপান করতে হবে। অন্দরে গৃহি
যত পুরনারী মায় দাস-দাসীদের পর্যন্ত সুরাপান করতে হবে। 'মাস্ট'। শ্যামাপূজ

দিন সকাল থেকেই এই পানের মাত্রা বাড়তে বাড়তে রাতের দিকে এক মহা তাণ্ডব। ঢুলিদেরও অব্যাহতি ছিল না। সুরাই হল শক্তি। মন্ত্র হয়ে মুখ দিয়ে বেরোবে।

ঢুলিরা দুপুরবেলায় স্নান করবে। অন্তঃপুরে গিয়ে গৃহিণীর কাছে গায়ে মাখার জন্য তেল আর জলপানি চেয়েছে। মদে চুর গৃহিণী বললেন, 'কি, তোরা আমাদের বাড়ির ঢুলি হয়ে তেল, জলপান চাচ্ছিস? মেঠাই খা-আ-আ, মোওম বাতি মাখ।'

এই কারণে সেবী, ঘোর তান্ত্রিক কালীশঙ্কর একদিন সন্ধ্যাহ্নিক শেষে একটা পা মুড়ে আর একটা পা সামনে বাড়িয়ে মালাজপ করছেন। এমন সময় মাতাল ভৃত্য এসে কর্তার পা টিপছে আর কাঁদছে। কালীশঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন,

'তুই কাঁদছিস কেন রে?'

'কত্তা এতদিন চাকরি করছি, কখনও কোনো অপরাধ করিনি, 'আজ আপনার একখানা পা হারিয়ে ফেলেছি, খুঁজে পাচ্ছি না।'

মদে চুর কত্তা হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে ধুর, এর জন্যে এত চিন্তা কীসের! বোধ হয় জলখাবার জায়গায় ফেলে এসেছি। যা ভেতর থেকে নিয়ে আয়।' ভৃত্য ভেতরে গিয়ে চারদিকে খুঁজে হতাশ হয়ে গৃহিণীকে জিজ্ঞেস করলে।

তিনি বললেন, 'আহ্নিকের জায়গাটা একবার খুঁজে আয়।'

কোথায় পা! ভৃত্য কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। 'কত্তা মশাই পা পাওয়া গেল না।'

কত্তা বললেন, 'শোন, আমার মনে হচ্ছে, পা-খানা নৈবেদ্যর সঙ্গে ঠাকুর মশাইয়ের বাড়িতে চলে গেছে। যা, গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয়!'

পুরোহিত মশাই ঢুলুঢুলু চোখে নেশার ঘোরে বললেন, 'ওরে কালীশঙ্করের পা যদি আমার বাড়িতে এসে থাকে, তাহলে কাল সকালে আমি নিজে মাথায় করে পৌঁছে দিয়ে আসব। তুই এখন যা।'

ভৃত্য মহা খুশি হয়ে ফিরে এল, 'কত্তাবাবু! আপনার পা কাল সকালেই এসে যাবে।' কালীপূজার রাতে কালীশঙ্কর গুরুদেবকে বলি দিয়ে স্বর্গে পাঠাতে চেয়েছিলেন। গুরুদেবও সানন্দে, কারণানন্দে রাজি। পুলিশ এসে এই পুণ্যকর্মে বাধ সেধেছিল।

সুখ দাও ভগবান

'সুখে থাকার কী উপায়?'

'সুখ কাকে বলে?'

'এই যেমন ধরো, টাকা-পয়সার অভাব থাকবে না। খাবো-দাবো, বেড়াব, হাহা করে হাসব। 'কোয়ার-ফ্রি-লাইফ'।'

'তার মানে টাকা চাই?'

'সেই রকমই মনে হয়।'

'কী করো?'

'সরকারি চাকরি।'

'ব্যবসা না করলে বড়লোক হওয়া যায়?'

'তা বটে। সবাই তাই বলে, আমার বউও তাই বলে। আমার মেজভাই পেন্টসের ডিলারশিপ নিয়েছে। গাড়ি কিনে ফেলেছে। নতুন ফ্ল্যাট। চেহারায় কি চেকনাই। আগে আসত, বউদি, বউদি করত। এখন আর আসে না, চিনতেও পারে না। পাশ দিয়ে গাড়ি নিয়ে ভ্যাঁক করে বেরিয়ে যায়। শুনছি, পার্টি করছে। ইলেকশনে দাঁড়াবে, সিলেকশন হলেই 'পেন্ট' মন্ত্রী।'

'তোমার কি মনে হয়, সে খুব সুখী?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'সে সুখী নয় অহংকারী। সুখ আলাদা জিনিস। তবে একটা গল্প শোনো। গল্পটার নাম—বিচার সার। এক সাধুর মনে হল, মানুষের হটকারিতা বন্ধ করার জন্যে কিছু একটা করা উচিত। ঝোঁকের মাথায় মানুষ কাজ করে পরে পস্তায়। কী করা যায়! সাধু একটা কাগজে বড় বড় করে দুটি কথা লিখলেন। কাগজখানা ভাঁজ করে, কাপড় দিয়ে ভাল করে মুড়ে সেলাই করলেন। তার ওপর লিখলেন, মূল্য—নগদ এক হাজার টাকা। পুরিয়াটা নিয়ে গেলেন বাজারে বিক্রি করার জন্যে।

'কে কিনবে? একে তো দাম এক হাজার টাকা, তার ওপর ভেতরে কী আছে সাধু বলছেন না। বলবেন না। দিনের পর দিন এই ভাবেই গেল। ক্রেতা নেই। শেষে এক ধনী ব্যবসায়ীর কৌতূহল, দেখাই যাক না জিনিসটা কী? হাজার টাকা দিয়ে কিনে বাড়ি নিয়ে গিয়ে খুলে দেখলেন, সামান্য একখণ্ড কাগজ। সেই কাগজে লেখা রয়েছে দুটি মাত্র কথা, 'বিচার সার'। ব্যবসায়ীর খুব রাগ হল নিজের ওপর। কী বোকা আমি! সাধু কেমন কানটি মলে হাজারটা টাকা নিয়ে সটকে পড়ল!

'যাই হোক, কিনে যখন ফেলেছি, তখন ফেলে না দিয়ে এটাকে শোবার ঘরের দেয়ালে সেঁটে রাখি। যতই হোক সাধুর কাছ থেকে কেনা! তুচ্ছ হলেও হাজার টাকা দাম।' এই ভেবে, শোবার ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিলেন—দুটি কথা—'বিচার সার'।

'কিছুকাল পরে—আরো বড় কারবারের সন্ধানে স্ত্রী আর শিশুপুত্রটিকে রেখে ব্যবসায়ী বিদেশে চলে গেলেন। সেখানে দিন রাত টাকা রোজগারের চিন্তায় বিভোর। স্ত্রী, পুত্রের কথা আর মনেই রইল না। টাকাই হল ধ্যান-জ্ঞান।

'বহু বছর কেটে গেল। ব্যবসায়ী কোটিপতি হলেন। প্রচুর টাকা। একদিন মনে হল, আর না, যথেষ্ট হয়েছে। কিছু না করলেও, বাকি জীবন হেসে-খেলে কেটে যাবে। এবার বাড়ি ফেরা যাক।

'সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললেন, কেনো খবর না দিয়েই হঠাৎ বাড়িতে উপস্থিত হবেন—সারপ্রাইজ। সবাই অবাক হয়ে যাবে। সে বেশ মজা! ব্যবসায়ী যখন বাড়িতে এসে পৌঁছলেন, তখন বেশ রাত। তিনি পা টিপে টিপে শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভীষণ মজা লাগছে, দীর্ঘকাল পরে স্ত্রীকে অবাক করে দেবেন। সটান সামনে—কি গো চিনতে পারছ?

'জানলা খোলা। তাকিয়েই চমকে উঠলেন। এ কি দেখছেন! খাটে স্ত্রীর পাশে শুয়ে আছে দশাসই এক পুরুষ। ব্যাভচারিণী! এই দেখার জন্য ফিরে এলুম! টাকায় সুখ ভেবে দীর্ঘ বিদেশ বাস। টাকা, টাকা, টাকা—যথেষ্ট হল। টাকাই হল। সুখ এল না। সুখের সন্ধানে গৃহে এসে চোখের সামনে এ কী অসুখ দেখছি!

'ব্যবসায়ীর হাতে তরোয়াল। দুটোকেই কাটবেন। নিঃশব্দে দরজা ঠেলে একেবারে খাটের পাশে। গভীর নিদ্রায় দুটি প্রাণী। তরোয়াল তুলেছেন — এ ঘুম আর ভাঙবে না।

'মারতে যাবেন, হঠাৎ চোখ চলে গেল দেয়ালের দিকে। কুড়ি বছর আগে সাধু
কাছ থেকে হাজার টাকায় কেনা সেই কাগজের লেখা—'বিচার সার'। ব্যবসায়ী থমকে
গেলেন, আর ঠিক সেই সময় দুজনেই জেগে গেলেন। স্ত্রী স্বামীকে প্রণাম করে সেই
পুরুষটিকে বললেন, 'বাবা! প্রণাম করো। ইনি তোমার পিতা!'

'শিশুপুত্রটিকে রেখে বিদেশে গিয়েছিলেন পিতা। সেই শিশু আজ বিশালকায়
যুবক। শ্রেষ্ঠী আর একটু হলেই কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলেন! বাঁচিয়ে দিল সাধুর
দুটি কথা—'বিচার সার'। কোটি টাকায় যা পাননি, পেলেন মাত্র হাজার টাকায়।

'হাজার টাকা কোটি টাকার সমান যদি বিচার থাকে। বিচারেই সুখ। হত্যাকারী
সুখী হবে কেমন করে। প্রতি মুহূর্তে মনে মনে নির্বিচারে খুন করে চলেছি—ঈর্ষার
অস্ত্রে। অসুখী, অসুখী বলে নিজেকেও মারছি তিলে, তিলে। হেঁকে বলো না—দুঃখ
আয় তোকে খুন করি। I am flourishing, I am prosperous. I am a
perennial youth in the garden of immortality.

(গল্পটি বলেছিলেন, সাধকশ্রেষ্ঠ পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী।)

ভোট দিন সকাল সকাল

'ভোর তিনটের সময় লাইন দেবো।'

'তিনটের সময় লাইন পাচ্ছ কোথায়? তুমি একাই দাঁড়াবে।'

'আস্তে আস্তে আমার পেছনে লাইন তৈরি হবে। একটু একটু করে আলো ফুটবে। ভোরের প্রথম কাক 'কা' করে উঠবে।'

'অর্থাৎ নির্বাচন শুরু। কা-কা, কাকে দেবে, কাকে দেবে? কোন বোতামটা টিপবে প্যাঁট করে? ভোরের প্রথম কাক সোচ্চারে বলতে চাইবে—গণতন্ত্রের শাবকরা শোনো বলি সার কথা, কাকস্য পরিবেদনা, বেল পাকিলে কাকে কী?

'আপনি সিনিক! ভোট দিতে দিতে বুড়ো হয়ে গেছেন। এই বছরে আমি প্রথম ভোট দোবো। গণতন্ত্রের মেশিনে আঙুল ঠেকাব। অতএব বুঝতেই পারছেন, আমার কি উত্তেজনা!'

কথা হচ্ছে কলেজে পড়া এক যোড়শীর সঙ্গে। এই বছরে সে প্রথম ভোট দেবে। বলিয়ে-কইয়ে মেয়ে। আবার কবিতা লেখে।

'তিনটের সময় বুথে যাবে? একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'আজ্ঞে না? শোনেননি, নেপোয় মারে দই। নেপোদের টেক্কা দিতে চাই। গণতন্ত্রের মন্দিরে মঙ্গল আরতির সময়েই হাজির হব। ফার্স্ট ভোটারেস।'

'ভোটারেস মানে?'

'গ্রামার পড়েননি, অ্যাক্টর, অ্যাকট্রেস, গড, গডেস। আমি তো স্ত্রী-লিঙ্গ!'

'এবারের নির্বাচনে অ্যাক্টর অ্যাকট্রেসের ছড়াছড়ি। তারকাখচিত গণতন্ত্র। সব

'কমিমে-কুত্তেকে' চুন চুন করতে যমের 'সাউথ ডোর' দেখিয়ে দেবে। তা তুমি অত ভোরে না গিয়ে চা খেয়ে ছটা নাগাদ গেলেই তো পার?'

'কী বলছেন, গণতন্ত্রের মন্দিরে গণদেবতাকে পুজো না চড়িয়ে চা খাবো? মুহূর্তটা একবার ভাবুন! পুব আকাশে ছ্যাঁক্।'

'ছ্যাঁক মানে?'

'ছ্যাঁক করে সূর্য উঠল। পোলিং বুথের দরজা খুললেন প্রিসাইডিং অফিসার। এক হাতে ঘণ্টা, আর এক হাতে একগোছা ধূপ ধোঁয়া ছাড়ছে। তিনি প্রধান পুরোহিত। ভেতরে নৈবেদ্য সাজিয়ে বসে আছেন সহকারী পুরোহিতগণ। প্রত্যেকের কপালে দগদগে লাল ফোঁটা। প্রধান পুরোহিত টিং টিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে, ধূপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু আরতি করলেন।'

'কার আরতি?'

'মঙ্গলচণ্ডী আর রণচণ্ডীর।

'চণ্ডী কেন?'

'হায় ভগবান! কিছুই জানেন না! মা দুর্গা হলেন 'রিপাবলিক'। নিজেই বলছেন,

'অহং রাষ্ট্র সংগমনী বসূনাং', রাষ্ট্রের অধিশ্বরী আমি। যুগে যুগে অসুররা 'রিপাবলিককে' চিৎপাত করে দিতে চাইবে। পুরাকালে ক্যাঁচা আর খাঁড়া দিয়ে ক্যাঁচা ক্যাঁচ করে দিতেন মা নিজে, আধুনিক কালে 'ব্যালটই' 'বুলেট'। একজনই বেঁচে উঠবে যন্ত্র-বাক্সে, বাকি সবাই, বল হরি, হরি বোল।

'প্রিসাইডিং অফিসার প্রথমেই আমাকে দেখবেন—সুপ্রভাত, সুপ্রভাত! বিয়ের সময় সিঁথিতে সিঁদুর। ভোটের সময় আঙুলে ফোঁটা। তারপর 'টয়লেটে' প্রবেশ।'

'টয়লেট? টয়লেট কোথা থেকে আসবে?'

'ঘরের একপাশে চট ঝোলানো একটা জায়গা, গোপন স্থান। সেইখানে ঢুকে ভোট করতে হয়। সকলের সামনে করা যায় না। গণতন্ত্র হল গোপন তন্ত্র। গোপনে মালাবদলের মতো। বরমাল্য পরাই তোমার গলে।'

'তারপর? এই প্যারডিটা পড়েছ? 'ওগো মা!/ভোটের দালাল চলি গেল মোর/ ঘরের সমুখ পথে। প্রতিশ্রুতির ফুল্‌কি ঝরিল/মাইকশিখর রথে!'

'শুনুন, ওসব পড়ার দরকার নেই, ভোট দান করে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে, তা না হলে শুকিয়ে মরে যাবে। টাকার মতো ভোটও দান করতে হয়। হিন্দি বলয়ে বলা হয় মতদান। এই একটা দিন আমরা দাতা। আমাদের দানে রাজনীতির গর্ভ থেকে ত্রাতারা বেরিয়ে আসবেন। স্বামীজি পড়েছেন?'

'সামান্য, সামান্য।'

'শুনুন তাহলে, দাতাকে কি বলছেন,

> দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
> অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
> 'দাও, দাও'—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।'

ভোট দান করে বেরিয়ে আসুন, আর ফিরে তাকাবেন না।'

'কালকের একটি ইংরিজি কাগজেব 'হেড লাইন' দেখেছ? Statutory warning : Voting can kill you. Laloo's constituency trembled as motorcycle gangs shot dead the defiant."

'পড়েছি। মরতে তো একদিন হবেই। ক্যানসারে মরার চেয়ে ভোট দান করে গণতন্ত্রের কোলে ডেড বডি ফেলে যাওয়া অনেক গৌরবের। আকাশবাণীতে দরখাস্ত দিয়েছি, ভোটের ভোরে চণ্ডীপাঠ। ভোটও তো দুর্গাপূজা। দুর্গ দখলের লড়াই। ভোরে ভোটারদের ঘুম না ভাঙালে সকাল সকাল ভোট দেবেন কী করে!'

'সারাটা দিন যখন পড়ে, তখন এত সকাল সকাল করছ কেন?'

'আমার ভোটটা আমিই দিতে চাই। উপকারী বন্ধুরা বাইক বাহনে রিভলভার শোভিত হয়ে আসার আগেই সরে পড়তে চাই।'

'কাকে দেবে?'

'বলতে নেই। 'সিক্রেট অ্যাফেয়ার'। আমি জানব আর যন্ত্র জানবে। তবে জেনে রাখুন। যে সব চেয়ে সুন্দর তাকেই দেবো। গোদামুখো, গুণ্ডা, গুণ্ডা লোক, খিটখিটে শাশুড়ি, শাশুড়ি চেহারার মেয়েদের আমি সহ্য করতে পারি না।'

'নির্বাচন তো ফ্যাশান প্যারেড নয়। ভারিক্কি চেহারার, খিটখিটে চেহারার মানুষ চাই। ডাকতে রানি, গুণ্ডা সর্দার, এঁরাই পার্লামেন্ট আলো করে থাকবেন। তোমার কেন্দ্রে একজন অভিনেত্রী আছেন।'

'তাঁকে ভোট দেবেন পুরুষরা।'

'তুমি তাহলে?'

'একজন আছেন/খুব সুন্দর। যে কোনো দিন অভিনেতা হয়ে যাবেন।'

'নির্বাচন কি স্বয়ম্বর সভা? আমি ভাবছি, ভোটের সকালে প্রভাত ফেরি বের করব, জাগো, জাগো পুরবাসী/গুটি গুটি যাও সব মতদান কেন্দ্রে/ সকলকেই দিও কিঞ্চিত/ না করো বঞ্চিত/গণতন্ত্র আঙুর গুচ্ছ। দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে এস ভাই/ করো না তুচ্ছ। জাগো জাগো পুরবাসী। হাং পার্লামেন্ট অবশ্যম্ভাবী।'

'আমি আপনাদের কালের কবি, হাসিরাশি দেবীর এই গানটি গাইব,

> এসো, এ বিধান-মহা-সভা-তলে,
> হও মনোনীত যত ছলে বলে।।
> শুধু বলে রাখি মনে রেখো, প্রিয়
> তোমার ছলনা বুঝিতে না দিয়ো।।"

'শোনো কন্যা, আমাদের যৌবনকালে ইস্টবেঙ্গল মোহন বাগানের ম্যাচের আগের দিন রাতে ময়দানে লাইন দিয়ে পড়ে থাকতুম। তারপর কাউন্টার খুললেই টিকিটের জন্যে দাঙ্গা। নির্বাচনও রাজনীতির ফুটবল। মাঠও নেই, বলও নেই, খেলাটা আছে। রাজনীতির মারাদোনাবা হাত দিয়েও গোলে বল ঠেলতে পারেন।

হ্যান্ড অফ গড।'

'পার্লামেন্টের গলায় দড়ি, না গলায় দড়ি পার্লামেন্ট! কী বলব?'

'যা ইচ্ছে বলুন। ভোট দেবেন সাত সকালে। এইটিই প্রাতঃকৃত্য।'

আজও দাঁড়িয়ে আছি

শরৎ আর শীত এই দুটি ঋতু অতীতের ঢাকনা খুলে দেয়। যত বর্তমান সব অতীতের প্রান্তরে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক জায়গা সেখানে। ওইটাই মনে হয় অনন্তের ঠিকানা। গত আর আগতের মাঝখানে বর্তমানে একটা চৌকাঠ মাত্র। ভবিষ্যৎ বর্তমান টপকে অতীতের তেপান্তরে চলে যাচ্ছে। সেখানে মিঠে আলো, মিঠে রোদ। সংঘাত শূন্য, মৃত্যুহীন একটা জায়গা। ভবিষ্যৎ বর্তমানে এসে মরে গিয়ে অতীতে চলে যায়।

শীত এসে উত্তুরে বাতাসে দক্ষিণের দরজা খুলে দেয়। অতীতের দরজা। যমের দক্ষিণ দুয়ার। আমি এটা বেশ অনুভব করি। ক্রমশ ছোট হতে হতে শিশু হয়ে যাই। দুজন রমণী এসে দুপাশ থেকে আমার দুটো হাত ধরেন। একজন আমার মা, আর একজন আমার বড় মা। ছেলেবেলায় পরিবার-পরিজনকে বলতে শুনেছি—দুজনেই ডাকসাইটে সুন্দরী। শিক্ষিতা। শিল্পকুশলী। দুজনেই সমান লম্বা, স্লিম।

আমার একটি হাত মায়ের হাতে, আর একটি হাত বড়মার হাতে। দুজনের পরিধানেই পিঙ্ক রঙের শিফন শাড়ি। থ্রি-কোয়ার্টার হাতার ব্লাউজ। হালকা নীল

কার্ডিগান। মাথায় সিল্কের স্কার্ফ। পায়ে ডোরা কাটা পাম শু। কানে দুলছে পেন্ডান্ট। গলায় সরু মফচেন। লম্বা, লম্বা ধবধবে সাদা আঙুল। দুজনেরই অনামিকায় লাল, টকটকে রুবির আঙটি। আমরা তিনজনে শীতের রোদে মজা করে হাঁটছি। কখনো ঝুলে পড়ছি। কখনো তিড়িং করে লাফিয়ে উঠছি। পায়ের তলায় বাঁশপাতা মচ মচ শব্দ করছে। বেশ কিছুটা দূরে আমার বাবা আর জ্যাঠমশাই গল্প করতে করতে হাঁটছেন। মাঝে মাঝে হাহা করে হেসে উঠছেন। প্রান্তরের নির্জনতায় দোলা লাগছে। দুজনেই কৃতী পুরুষ। পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

আমরা সাঁওতাল পরগনার স্বাস্থ্যকর কোনো একটা জায়গায় বেড়াতে এসেছি। যেমন আসি প্রত্যেক বছর। অনেক কথা, গল্প, হাসি ফেলে রেখে যাই। নানা রঙের অদৃশ্য নুড়ি। অদৃশ কালপ্রবাহ তার ওপর দিয়ে বইতে থাকবে। চড়া শীতে তাই কড়া রোদ লেবুর মতো মোলায়েম। দূরে, বহু দূরে ধূসর পর্বতশ্রেণি আকাশ আটকে তরঙ্গের মতো বিস্তৃত। দুধারে মুংলি বাঁশের ঝাড়। বিশাল বিশাল ইউক্যালিপটাসের সার। সায়েবদের মতো গায়ের রঙ। তেলা, মসৃণ। পাতায় পাতায় সুন্দর গন্ধ। আর একটু এগোলেই সেই নদী। সূর্য নিয়ে ছুটছে। ছোট ছোট তরঙ্গভঙ্গে চিকির মিকির হাসি। নাকে আসবে জলের গন্ধ। শুকনো শীত ভিজে ভিজে হয়ে যাবে। নদীর বুক থেকে একটা আলো উঠে এসে আমার মায়েদের মুখ দুটিকে উদ্ভাসিত করবে, নাকের নাকছাবির পাথর আভা ছড়াবে। আমি অবাক হয়ে দেখব—দুজন মা দুর্গা নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে বহু রকমের পরিযায়ী পাখির হরেক ভাষার কলরব শুনছেন। সাদা, কালো, চকোলেট, কতরকমের রঙ, কতরকমের জলখেলা।

মা তাঁর দিদিটিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকবেন। কেন পাখিরা স্বদেশ ছেড়ে এই নির্জন বিদেশে চলে আসে? এখন এই বয়েসে আমি যেমন ওই দুজনকে প্রায়ই প্রশ্ন করি। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে আপনারাই বা কেন পরিযায়ী পাখির মতো অনন্তের আকাশে উড়ে গেলেন। হাসি-খুশি দুজন মানুষের জীবন থমকে গেল। রান্নাঘরে শ্মশানের নীরবতা নামল। জোড়া উনুনে নানা রকম রান্নার কেরামতি বন্ধ হল। ফুলবাগানে ফুল ফুটতে ফুটতে আর ফুটল না। আগাছার উল্লাস। সাজানো ঘরের সজ্জায় পাউডারের মতো ধুলোর স্তর জমতেই থাকল। বড়মার এস্রাজ, মায়ের হারমোনিয়াম পরিত্যক্ত বালিকার মতো পড়ে রইল একপাশে। কোনো রাতে হঠাৎ বেজে উঠল না আর। একটা একটা করে তার ছিঁড়তে লাগল আচমকা শব্দে। ছাতের তারে শুধুই ঝোলে পুরুষদের জামা কাপড়। শীত এল বাসন্তী রঙের শাড়িগুলো গেল কোথায়? অতীত অতি অহঙ্কারী। বর্তমানের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না। মৌনী।

আমরা হাঁটছি। এবার নদীর কিনারা ধরে। ওদিকে একটা দেশ আছে—চুনার। ঐতিহাসিক জায়গা। আমাদের লক্ষ্য একটি নীলকুঠি। ভেঙে-চুরে পড়ে আছে ইটে লেখা ইতিহাস। সার সার শ্যাওলা ধরা চৌবাচ্চা। যখন নীল হত তখন এই চৌবাচ্চায়

ভেজানো হত। হাফপ্যান্ট পরা নীলকর সাহেব বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকত ও
জায়গাটায়। বিশাল একটা অশ্বত্থ গাছ বাড়িটার মাঝখান থেকে সোজা উঠে গে
আকাশের দিকে। বসে আছে এক ঝাঁক টিয়া। মহা কলরব। একটা নৌকোর কঙ্কা
পড়ে আছে নদীর তীরে। আমার দুই মা হঠাৎ গান ধরলেন, রবীন্দ্রসংগীত। খা
নীলকুঠির ভেতর থেকে সেই গান প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসতে লাগল। ছোটমাযে
কী আনন্দ! গান ছেড়ে কু, কু করে চিৎকার করতে লাগলেন। বড়মা আদর ক
পিঠে একটা কিল মেরে বললেন, 'তুই কি কোনদিন বড় হবি না?' ছোটমা বড়মা
জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দিদি, তুমি বড় হও, আমি ছোটই থাকি।'

সেদিনও ছিল শীতের সকাল। খুব ভোর। চারপাশ ধোঁয়া ধোঁয়া। রাস্তার আ
যেন নেশাখোরের চোখ। বড়মা দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মূর্তি। বিদায়! ছো
বিদায়! ভাবিস না, তোর ছেলেটার জন্যে এখনো একজন মা রইল। একটি প্রদী
তিন দিন জ্বলে রইল একটি নিরালা ঘরে। মানুষ প্রদীপ হয়ে যায়, তারপর উ
যায় আকাশে একটি তারা। যে চিনতে পারে, সে পারে। তিনটে বছর! বুঝতে
পারিনি, যে আমার ছোট মা নেই। আবার শীত। এবার সাঁঝবেলা। খেলার মাঠে
ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে কুয়াশা। বিশ্রী মেঘ মেঘ এক বিকেল। আ
বাড়ি যাব। কিছুতেই ওরা আমাকে যেতে দেবে না। আমি বন্দী না কি? মারামা
করে, আঁচড়ে-কামড়ে ছিটকে চলে এলুম।

ঘর আছে। বড়মা নেই। কেউ নেই। এইবার আমার দাঁড়িয়ে থাকার পালা। আজ
দাঁড়িয়ে আছি। নিরালম্ব দুটি হাত দুপাশে ঝুলে আছে। ধরার কেউ নেই।

আজ বিজয়া

আজ বিজয়া। সকাল থেকেই সাজ সাজ রব। পাড়ার প্রতিমা জলে পড়া মাত্রই শুরু হবে বেপরোয়া কোলাকুলি। তারপর যত রাত বাড়বে, পদযুগল বেসামাল, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ। খিল খিল হাসি। লঘু গুরু জ্ঞান রাতের মতো লোপাট।

বড় কত্তা মেজ কত্তাকে বলছেন, 'সিদ্ধিদাতা গণেশ মানে জানিস?'

'জানি বলেই তো যাচ্ছি।'

'পাক্কা দু ভরি। ফর্মুলা মনে আছে?'

'অফকোর্স।'

'একবার ঝালিয়ে নাও।'

'কাগজি বাদাম, শসার বিচি, গোলাপ পাপড়ি, মরিচ, দই আর একটা তামার পয়সা।'

'পারফেক্ট! যাও লড়ে যাও।'

বাজারের মোড়ে গাঁজা, আফিং আর সিদ্ধির দোকান। সে দোকান আর নেই। আমি পঞ্চাশ সালের কথা বলছি, যখন বাঙালি বাঙালি ছিল। আধা সাহেব আধা হিন্দুস্থানি হয়ে যায়নি। জনজীবনকে তালগোল পাকিয়ে দিতে টিভির আগমন

ঘটেনি। রাজনীতিও এত ক্ষুরধার হয়নি। বাঙালি এমন হতচ্ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যায়নি। মধ্যবিত্তের পায়ের তলায় মাটি ছিল। জীবনে স্বপ্ন ছিল।

মোটামুটি সমৃদ্ধ একটি যৌথ পরিবার। সদ্ভাব আর সম্ভাবনায় ঢালাই। দলাইমলাই থাকলেও দলাদলি নেই। নারী স্বাধীনতার ধাক্কায় কেউ বিগড়ে যায়নি। 'মা'-এর সংখ্যা এমন বিপজ্জনকভাবে কমে যায়নি। একালের মেয়েদের পরমায়ু তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ! যৌবন গেল তো সব গেল—খেল খতম। সেকালের মেয়েরা 'মা' হয়ে শ্রদ্ধার আসনে ষাট, আশি বছর স্বচ্ছন্দে বসে থাকতেন। যত বয়স বাড়ত ততই গুরুত্ব বাড়ত। সংসার চলত অন্তঃপুরের অদৃশ্যশাসনে। সবাই জানত—বাপের চেয়ে মা দয়াল।

বিজয়ার সকাল, বড়কি, মেজকি, ছোটকির সকাল। সদা হাস্যময়ী, সর্বংসহা শ্বশ্রুমাতা 'কো-অর্ডিনেটর'। তিনি তাঁর নারীবাহিনী নিয়ে রান্নাঘরে লড়াই করছেন। মা জলপথে কৈলাসে ফিরে যাবেন। আর শত শত মহিষাসুর মহল্লায় মহল্লায় কোলাকুলি করে ফিরবেন। সরস বৎসরান্তিক আলিঙ্গন। এঁদের মধ্যে অনেকে প্রবাসী। লক্ষ্মীপুজা শেষ করে কেউ যাবেন দিল্লি, কেউ পাটনা, বোম্বাই, মাদ্রাজ। বাড়িটি পড়ে থাকবে তালাবন্ধ, মাধবীলতার আলিঙ্গনে। পূর্বপুরুষদের চিত্রপট, কেয়ার অফ মাকড়সা। চৌকিদার ধেড়ে ইঁদুর, লেংটি ইঁদুর। গান শোনাবে ঘুলঘুলিবাসী চড়াই, শালিখ।

কালোজিরে মাখা বড় বড় ময়দার তাল ময়ানসহযোগে সুন্দরীদের হাতের পীড়নে, শ্রবণে চুড়ির জলতরঙ্গ নিয়ে ক্রমশই নিমকির ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। বড় তিনকোনা, কুঁচো। একটা উনুনে বিরাট হাঁড়িতে ভুড়ভুড় করে কী একটা ফুটছে। ফুস ফুস বাষ্প। সাত্ত্বিক গন্ধ। মটর সেদ্ধ হচ্ছে, কাঁচা শালপাতার বাতাবরণে। প্রবল একটা ঘুগনির প্রস্তুতিপর্ব। নিচের উঠোনে প্রবল ঠোকাঠুকির শব্দ। না, ফার্নিচার তৈরি হচ্ছে না, গোটা পঞ্চাশ নারকোলের মাথা ফাটানো হচ্ছে। মনুর মা 'কুরুনি' কাঁধে মহিলা বলরামের মতো ঘুরছে। একটু পরেই নারকোল কোরার পাহাড় তৈরি হবে। তিন বউয়ের পরনেই তাঁতের ডুরে শাড়ি। নতুন। মাড়, খড়খড়ে। মেজ বউয়ের পশ্চাদ্দেশের সঙ্গে ছোট বউয়ের পশ্চাদ্দেশের সামান্য সংঘর্ষ। দু'জনেই দুদিকে ঝুঁকে পড়েছে। মেজ সোজা হতে হতে মৃদু গলায়, 'পাছা নয় ত, ধামা!'

ছোটর ফিস্ ফিস্, 'অসভ্য! নিজেরটা কী?'

এই সব মধুর দৃশ্য, ঘটনা, সুখ কে নিয়ে চলে গেল! বাঙালির প্রতিমার বিজয়া অনেক আগেই যে হয়ে গেছে! কেউ রাখার চেষ্টা করল না। রাখলে কী ক্ষতি হত! মাটির মা জলে, গর্ভধারিণী মা পথে!

'হ্যাঁ রে মেজকি, বেড়ালটা তখন থেকে ম্যাও ম্যাও করছে কেন, দুধ দিস নি?'

'আমার দুধ কোথায়? ও ছোটকি দেবে।'

বড়র স্নেহের ঝাপ্‌পড়ে মেজর বিশাল খোঁপা টাল খেয়ে গেল। আর তখনই শিব মহল থেকে অনুরোধ এল, 'চায়ের কোনো সম্ভাবনা আছে কি?' বড়কর্ত্তা না কি বলেছেন, 'বাঁজা সকাল। চা প্রসব করেনি।'

বেলা তিনটে। সারা বাড়িতে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। সংসারের মা স্বয়ং চিনি সহযোগে নারকোল পাক করতে বসেছেন মোলায়েম আঁচে। অতি কঠিন কাজ। আর একটু পরেই মা নামবেন বেদি থেকে। পশ্চিমের আকাশে চাঁদের দশমী-খেয়া আকাশ গঙ্গায় ভাসমান। নিজের হাতে ঘরের মা এই মিহি নাড়ুর একটি পারের মায়ের ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে কানে কানে বলবেন, 'ও মা! এবার এস।'

ঢাকে বিসর্জনের বোল। বউদের মুখে সিঁদুরে লাল। সব যেন মঙ্গলচণ্ডী। পথে হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে। বিসর্জনের তোড়। সিদ্ধির কৃপায় বড়কর্তা মধ্যরাতে ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। 'কী হল কী?' মেজও চড়ে আছেন,বললেন, 'ভেরি প্যাথেটিক। বেচারার মা গঙ্গায় আত্মহত্যা করেছেন সপরিবারে। শুধু কার্তিক এখনো সাঁতরাচ্ছে।'
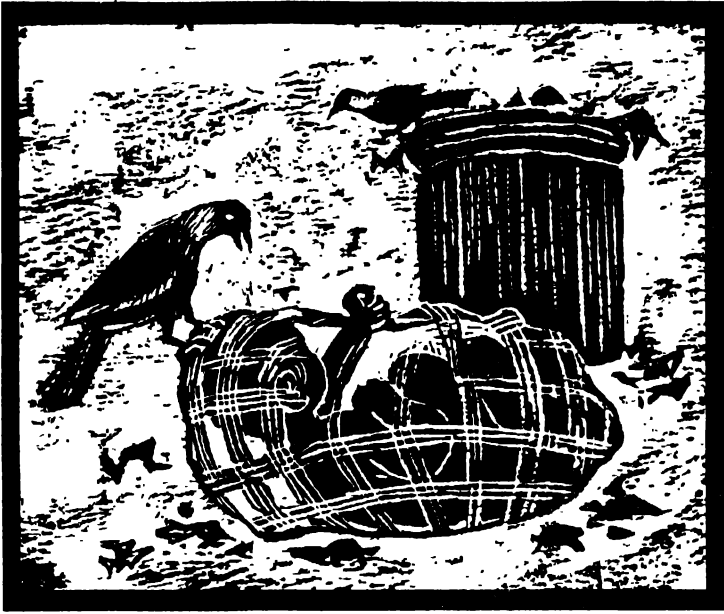
জীবনের কার্টুন

খাওয়া-পরার সমস্যা মিটে গেলেই শুরু হয় আসল সমস্যা। একটা লোহার গজালের চেয়ে অসংখ্য আলপিনের যন্ত্রণা দেবার ক্ষমতা অনেক বেশি, যাকে বলে শরশয্যা। যত টাকা বাড়ে তত অশান্তি বাড়ে।

এত বড়লোককে একদিন খুব চিন্তিত দেখে প্রশ্ন করলুম, 'খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। কী হল গোপালদা, শেয়ারের দাম পড়ে গেল না কি?'

তিনি বললেন, 'আরে, শেয়ারের দাম আজ পড়লে কাল উঠবে; কিন্তু এই যে রোজ ভুসভুস করে চুল পড়ে যাচ্ছে, সে কি আর উঠবে!'

'আপনার মাথায় যা চুল রোজ একশোটা করে পড়ে গেলেও টাক পড়তে মিনিমাস তিরিশটা বছর। আর টাক তো পুরুষের ব্যক্তিত্ব।'

'আরে ভাই আমার চুল নয় আমার গিন্নির চুল। ভয়ে চিরুনি ঠেকাতে পারছে না। নার্ভাস ব্রেকডাউন। এমন কোনো জিনিস নেই যা মাথায় লাগাচ্ছে না। আরো কেলেঙ্কারি কার পরামর্শে জানি না কপালের ওপরটা ব্লেড দিয়ে চেঁচে সাফ করে দিয়েছে। তাতে কী রকম দেখতে হয়েছে জানো, একেবারে লেডি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এখন আমাকে আদেশ হয়েছে, টাটকা গরম গোবর জোগাড় করে আনতে হবে। আমি বলেছিলুম, সে আমি কোথায় পাব! বললে, পয়সা ফেললে গণ্ডারের গোদুগ্ধ পাওয়া যায়।'

'বউদি ঠিকই বলেছেন, আপনার পয়সার অভাব নেই। আমার সঙ্গে চলুন একটা নধর গরু কিনে দিচ্ছি, ঘণ্টায়, ঘণ্টায় ধোঁয়া ওঠা গরম টাটকা গোময় বউদির মাথাময়।'

'গরুটাকে রাখব কোথায়?'

'কেন? গাড়ি রাখার গ্যারেজ করেছেন, গরুরও গ্যারেজ হবে।'

'পাবলিক আপত্তি করবে। এই পশ এলাকায় গোয়াল চলবে না।'

'বেশ, তারও উপায় আছে। ক্রেন দিয়ে গরুটাকে ছাতে তুলে দোবো। তার জন্যে একটু বড় মাপের একটা টয়লেট করে দিন। একটা শালোয়ার।'

'আরে ভাই রসিকতা করছ করো, টাকের বেদনা তুমি কী বুঝবে। মানুষ মেনে নেয় ঠিকই তবে জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়। চুল একটা কত বড় শোভা! চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা। জীবনানন্দ। যুগ যুগ ধরে কেশ নিয়ে কত কবিতা!'

আর এক বড়লোকের সঙ্গে দেখা হলেই দু চারটে এদিক-সেদিক কথার পর সেই এক অভিযোগ, 'বুঝলে, একালে রাবড়ির কোয়ালিটি বড় পড়ে গেছে। সেকালের মতো চৌকো চৌকো সরঅলা রাবড়ি আর পাওয়া যায় না। সারা কলকাতার রাবড়ির স্যামপেল টেস্ট করে দেখলুম, রাবড়ি খাওয়াটা ছাড়তেই হবে। ফুলকো লুচির খোসা দিয়ে পোয়াটাক রাবড়ি!'

মানুষের ভাত জুটছে না। ইনি রাবড়ির শোকে অধীর।

কত্তা-গিন্নি দুজনেই আধপাগলা হয়ে ঘুরছেন। ব্যাপার কী! মাথামোটা ছেলেটিকে কলকাতার নামী স্কুলে ভর্তি করতে পারছেন না। যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেও পাগলা করে ছাড়েন, 'সোর্স, সোর্স জানা আছে ভাই!' এনি অ্যামাউন্ট। প্রয়োজন হলে দেশের প্রপার্টিটা বেচে দোবো।'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। ওদিকে দুজনের নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছিল। একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করেছে, 'কী রে রেশানে চিনি আছে!' সে বলেছে, 'আছে, আছে।' সঙ্গে সঙ্গে এ লাফিয়ে চলে গেল, 'আছে, আছে, সোর্স আছে!'

'ধ্যার মশাই কিসের সোর্স! বেশানে চিনি আছে!'

বোঝাতে গেলুম, 'মাথাটাই সব, স্কুলে কী হবে! পঞ্চাননতলা স্কুল থেকেও ভাল ছেলে বেরোয়।'

কে কার কথা শোনে! সোর্স, সোর্স করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। যাকে মানুষ করার জন্যে পাগল, সে সারাদিন ঘাড় উঁচু করে টিভির সামনে বসে থাকে। কার্টুনের সামনে এক জ্যান্ত কার্টুন!

কেটেকুটে ছোট করে কি সুখ, কি সুখ

ভাবা যায় না। আজকাল যে কত উন্নতি হয়েছে! আগে কত অসুবিধে ছিল! ফোনে বলা মাত্রই দুটো লরি এসে গেল। সঙ্গে সাতটা তাগড়া লোক। তাদের মধ্যে একজন সুপারভাইজার। তার মাথায় ক্রিকেট ক্যাপ। সামনের কার্নিস বের করা দিকটা পেছন দিকে। চোখে রঙিন চশমা। ভীষণ এক্সপার্ট। নিমেষে বাড়ি খালি করে লরিতে তুলে দিলে। পুরনো বনেদী বাড়ির বড় বড় ঘরে স্মৃতি আর হাহাকার ছাড়া কিছুই পড়ে রইল না। দুটো লিভিং ফার্নিচার নিয়ে বড় বিপদে পড়া গিয়েছিল। একটা আশি বছরের পুরনো, সেটার নাম বাবা। অনড় টাইপের একটা চরিত্র। স্টেটসম্যান ছাড়া কাগজে পড়বে না। থিন অ্যারারুট ছাড়া বিস্কুট খাবে না। লাইফ বয় ছাড়া সাবান মাখবে না। আর একটা সত্তর বছরের পুরনো। সেটার নাম মা। সবেতেই অশান্তি। কেউই পছন্দের নয়। দুটোকেই ভুজুং-ভাজাং দিয়ে একটা ওল্ড-এজ-হোমে পার্সেল করে দিয়েছি। এখন সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। ম্যানেজমেন্টকে 'ক্লিন চিট' দিয়ে এসেছি। মরে গেলে পুড়িয়ে দেবেন। বিল পাঠিয়ে দেবেন। কিম্বা 'কশান মানি' থেকে কেটে নেবেন। ঝাড়লণ্ঠনের মতো বাবা-মার আর প্রয়োজন কি জীবনে! যখন ছিল তখন ছিল। মানুষ করে ছেড়ে দিয়েছেন আমিও উপযুক্ত জায়গায় ছেড়ে দিয়ে এসেছি। সুগার, বাইপাশ, পেসমেকার, ওল্ড-এজ-হোম, ডিভোর্স—এ সব হল স্ট্যাটাস সিম্বল। চল্লিশ বছর, পঞ্চাশ বছর একই বউ, একই স্বামী সংসার করছে। একালের কনসেপ্টে আতঙ্কজনক। জীবনের স্বাদটাই নষ্ট হয়ে যায়। মোবাইল ফোনের মতো মোবাইল লাইফ। আটঘাট বাঁধা অস্তিত্ব নয়, ঘাটে ঘাটে জল খাওয়া।

সিকিউরিটি শব্দটাই মেয়েলি। জব সিকিউরিটি, সোস্যাল সিকিউরিটি, ফ্যামিলি

সিকিউরিটি, মানুষকে দুর্বল করে দেয়। জীবন হবে গাড়ি চালানার মতো। স্পিড। টেকিং, ওভার টেকিং। টায়ার ফাটতে পারে, ব্রেক ফেল করতে পারে, হেড-অন কলিসান হতে পারে। সো হোয়াট। লিভিং লেডি ডায়না স্টাইল। হওয়ার কথা রানী। হয়ে গেল হাই স্পিড ডেথ। জীবনে কাঁটা, মরণে গোলাপ।

বেঁচে থাকার কনসেপ্টটাই পালটে ফেলতে হবে। আধ হাত ঘোমটা টানা, ডুরে শাড়ি পরা, 'সাত চড়েও রা না কাড়া', 'বাঙলার বধূ, বুকে তার মধু, নয়নে নীরব ভাষা টাইপের' বউ অসম্ভব। বসবাস হয় আঁতুড়ে, না হয় রান্নাঘরে। এক বাটি সরষের তেল নিয়ে বসতে হবে শাশুড়ির পদসেবায়। যার বউ সে বেচারার কী অবস্থা! সে কালের মানুষের বেঁচে থাকার কোনো ছিরি ছাঁদ ছিল না। কর্তা বাড়ি করলেন তার কোনো প্ল্যান নেই। উঁচু উঁচু ধাপঅলা কাশীর সিঁড়ি। সঙ্কীর্ণ। ঘরের পর ঘর। এমন কায়দায় তৈরি আলোবাতাস যেন না আসে। ভেতরে একটা দালান। শ্যাওলা ধরা। জল প্যাচ প্যাচে। একটা পাতকো। দড়ি, বলতি। বালতিটা লোহার। লম্বা নারকোল দড়ি। গোটাকতক গেঁট থাকতেই হবে। জল তোলার সময় জড়াবেই জড়াবে। পুরুষরা বলবে শালা। মেয়েরা বলবে মুখপোড়া। ভ্যাটভ্যাটে নর্দমা। দিবা রাত্র দুর্গন্ধ। মশা, মাছির জন্মস্থান। পেছনে আঁস্তাকুড়, ছাই গাদা। মাথা মোটা গোবদা হুলো। গিন্নির আদুরে মেনি। সকাল, সন্ধে জোড়া কয়লার উনুনের ধোঁয়ায় আরতি। সেই কাকভোরে ঘোষ, বোস, মিত্তিরদের কোম্পানি দুর্গা, দুর্গা বলে খুলে গেল! সব চড়াই পাখির বাসা। বড়য়, ছোটয় মিলিয়ে অগুনতি। প্রবীণ, প্রবীণাদের দেহ ব্যাধিমন্দির। কারুর কোমর সোজা হয় না। সোজা হতে গেলেই 'মট' করে একটা মৃদু শব্দ। তারপর নিতম্বে একটি হাত রেখে, 'গেছি রে, গেছি রে! মুখ পোড়া কোমোর।' গিন্নিদের এই কোমর সমস্যা স্বামী সমস্যার মতোই একান্ত আপন ছিল? কথায় কথায় তাঁরা সোহাগ করে বলতেন, 'বরাতে একটা লোক জুটেছে বটে, সারাটা জীবন জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে মারবে। কোত্থেকে এক গাদা কচুরি খেয়ে এসে মরেছে। সেই সকাল থেকে গাড়ু হাতে যাচ্ছে আর আসছে। এইবার দোবো একদিন নোলায় গরম খুন্তির ছ্যাঁকা। ঘোষ গিন্নির সঙ্গে খুব পিরিত হয়েছে যে। আমাকে আর ভাল লাগছে না। লাগবে কেন? আমার যৌবন যে ফুরিয়ে গেছে। মিনসেগুলো সব কাঙালের জাত। আয়! তুতু। ন্যাজে পটাপট্ করাতে করাতে চলল। ওরে নতুন কি পাবি? সবই ত সেই এক ছিরি।'

বড় কত্তা ফতুয়া পরে বাজার যাবেন। খাটো ধুতি। হাতে চটের ব্যাগ। ব্যাগের ভেতরে চ্যাটচ্যাটে তেলের টিন। মুখ ফাঁদালো একটা শিশি। আখের গুড় ঢুকবে। দুটো ডেও পিঁপড়ে আগে থেকেই ঢুকে বসে আছে। সঙ্গে চলেছে খোকা চাকর। তৈরি ছেলে। হয় বিহারি না হয় ওড়িশি। সেকালের মানুষ বিহার বলতেন না। বলতেন বেহার। খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলতেন উড়ে। ছোকরাটির হাতে আরো ব্যাগ। ব্যাগ শব্দ আধুনিক, প্ল্যাস্টিক ব্যাগ, পলিথিন ব্যাগ। সেকালের সব চটের থলে। একটা ব্যাগ সে বাঁ হাতে ধরে আছে। সেটা মাছের থলে। সেকালে খুব ছোঁয়া ছুঁয়ির ব্যাপার ছিল। এঁটো-কাঁটার বিচার।

কাটোয়ার ডেঙ্গো ডাঁটা, কুমড়ো, পাটশাক, পুঁটি, মৌরলা, ফ্যাসা, পাবদা, কুঁচো চিংড়ি, কাদা চিংড়ি, বাটা, মিরগেল, কালবোশ, রুই। সজনেডাঁটা, সাঁতরাগাছির ওল, মানকচু, গন্ধরাজ লেবু। মেয়েদের সারাটা দিন রান্নাঘরে বন্দী করে ফেলার যাবতীয় চক্রান্ত। গুঁড়ো মশলার নাম শোনেনি কেউ। তিনখান শিল নোড়া। মানদা, মোক্ষদারা উপুড় হয়ে বসে। হলুদ, সরষে, জিরে, আদা বাটা বাটছে দুলে দুলে। একটায় ডাল বাটা হচ্ছে। ধোঁকা বাঙালির ভীষণ প্রিয়। হজমশক্তিও ছিল সেই রকম। একটা ইলিশ, আধখানা পাঁঠা, এক ডজন ল্যাংড়া কি হিমসাগর বেমালুম তলিয়ে যেত। নস্যি। খেয়ে আর খাইয়ে ফতুর। কৃপণ লোকেরও অভাব ছিল না। ওয়ান পাইস ফাদার মাদার। ভাইকে ফাকি দেওয়া। বিধবার সম্পত্তি মেরে দেওয়া। তবে যৌথ পরিবার টেঁকসই হত সদস্যদের উদারতায় আর কর্তার ত্যাগে। কষ্টের সঙ্গে প্রচুর আনন্দ ছিল। ভালবাসার বাঁধন ছিল। অল্প বয়সে বউরা এসে শাশুড়ির আগাপাশতলা ট্রেনিং-এ ভবিষ্যতের শাশুড়ি তৈরি হত একটু একটু করে। এতে অপমানের কিছু ছিল না; ববং সুখ ছিল, আনন্দ ছিল, গৌরব ছিল, গর্ব ছিল। সালঙ্করা, লাজনম্র বধূটি যখন শশ্রূমাতার সঙ্গে প্রতিবেশীর বাড়িতে পালাপার্বণে যেত তখন তার স্বতন্ত্র স্ট্যাটাসে। কেউ বুকের কাছ থেকে হারটা টেনে বের করে দেখতে দেখতে বলছে, কমসে কম বিশ ভরি। বধূটি মৃদু স্বরে, 'কালচারড ভয়েসে' বলছে, 'মা দিয়েছেন!' মিত্তির পরিবারে পয়সা এই ভাবেই এক অধিকারী থেকে আর এক অধিকারীর কাছে চলে যায়। 'ট্র্যাডিশন'। মেয়েটি যখন বাপের বাড়ি যায়, তখন তার কী খাতির। গর্ভধারিণীও সমীহ করেন। ফেমাস মিত্তির বাড়ির বউ। শ্বশুর অ্যাটর্নি। মোটোরগাড়ি আছে। কোর্ট বন্ধ হলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে পুরীতে বেড়াতে যান। হোটেল বাঁধা আছে। বউমা বলতে শ্বশুর অজ্ঞান।

সেকালেব বাঙালি-জীবনের কিছু অনুষঙ্গ ছিল, যেমন, বাঁদিপোতার গামছা, মোষেব শিঙের ধারাল চিরুনি, জর্দা-পান আর সরষের তেল। সরষের তেল একটা 'ফ্যাড'। তখন অন্য ভোজ্য তেল ছিল না। তিল আর নারকোল তেল মাথার জন্যে। একটা উৎপাতের কথা প্রায়ই শোনা যেত। উর্ধ্ববায়ু হয়েছে। কথায় কথায় রেগে যাচ্ছে। রাবণের মতো হুঙ্কার ছাড়ছে। বউকে বেড়াল ভেবে স্টিক নিয়ে তাড়া করছে। বায়ু মাধ্যাকর্ষণ উপেক্ষা করে ব্রহ্মতালুতে চার্জ করছে। তিলের তেল থাবড়াও। যদি কাজ না হয় মাথার মাঝখানটা গেলে করে কামিয়ে ঘৃতকুমারীর পুলটিস চড়াও। বাদামতেল বাজারে এল বটে, কিন্তু তেমন বাজার পেল না। বাঙালি মানসে খাঁটি কড়ুয়ার তেলের অটল আসন।

নেয়াপতি ভুঁড়ি। 'নাইকুণ্ডলে' আগে ফোঁটা দুই সরষের তেল স্থাপন করো। আয়ু বাড়বে। আম, কাঁঠাল, মাছের মুড়ো, ক্ষীর দই, কচি পাঁঠা, মাগুরমাছের ঝোল। সেকালের পুরুষগুলো এককথায় পুরুষ ছিল। আকাট; বিউটি কনসাস ছিল না। ঠোঁটের ওপর হাবিলদারি গোঁফ ঝুলছে। ফ্যাশান বলতে, ওইটাকেই 'কার্তিক কাট', বা 'মাছি কাট' দেওয়া। চুলে 'বাটি ছাঁট'। মাথার মাঝখানে এক থাবা চুল। চার পাশ পরিষ্কার করে কামানো। আগাপাশতলা সরষের তেল মেখে পাতকোর জলে হড়হড়ে

চান। তেল চিটচিটে গামছায় গা মুছে, দেব-দেবীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বার কয়েক নাক মলে, কান মলে পাপস্খালন করে আসেন আহারে বসা। সেকালে ঘরে ঘরে মেয়েদের সূচিশিল্পের একটা ব্যাপার ছিল। দেয়ালে ঝুলত ভেলভেটের কাপড়ে ছুঁচ-সুতোয় তোলা পরম পরোয়ানা, 'পতি পরম গুরু' অনিবার্যভাবে গুরুর গ-এর তলার হ্রস্ব উ তেমন ভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় পাঠ দাঁড়াত, পতি পরম গরু। এতে পতিরা আদৌ উত্তেজিত হতেন না। হিন্দু ধর্মে গুরু আর গরু উভয়েই সমান পবিত্র। তলায় শিল্পীর নাম, লতিকা।

নানা রঙের সুতো দিয়ে বোনা আসনে কর্তা বসবেন। কাঁসার থালা। চারপাশে গোল করে সাজানো ছোট-বড় কাঁসার বাটি। কাঁসার গেলাসে জল। সামনে পাখা হাতে ঢল ঢল গৃহিণী। গোল গোল হাতে ঠুনঠুন্ সোনার চুড়ি, বালা, রুলি। গৃহিণীর অদূরে আধ চোখ বোজা ধবধবে সাদা বেড়াল। গৃহিণী পরিতোষ করে কর্তাকে খাইয়ে-দাইয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলিয়ে সারা দিনের মতো আদালতে মক্কেল মারতে পাঠাবেন। মক্কেলই তো লক্ষ্মী। ওদের সর্বনাশ এদিকে পোষ মাস। বেড়াচাঁপার বাগান বাড়িটা প্রায় হয়ে এসেছে। সামনের আশ্বিনে চণ্ডীপাঠ করে পুজোর ছুটি উদযাপন করার কথা। মা মঙ্গলচণ্ডী প্রসন্না হও মা। আর কটা ফৌজদারি এদিকে ঠেলে দাও। আধ চোখ বোজা বেড়াল কর্তার টেম্পার বুঝে মাঝে মধ্যে 'মিউ' ছাড়ছে মিহি সুরে। মুড়োটায় হাত পড়লেই এদিকে কিছু কাটপিস আসবে। বেড়াল বলতে চাইছে, আমি ঠিক অধৈর্য নই তবে নিরামিষ মহল্লা থেকে বেরিয়ে এস। মুড়োটা করুণ চোখে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে! মৌরলা, পুঁটির প্রসাদ যে পাব না, সে তো জানি। তোমার করুণায় তাদের পুরো শরীর তোমার ভুঁড়ির আশ্রয়ে।

সরষের তেল আর বাঙালি শরীর। এই রকম বলা হত, বাঙালির শরীর তেলে আর জলে। রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিতে' এই রকম পাওয়া যাচ্ছে। বাঙালি 'ক্যারেক্টারিস্টিক'। তিনি লিখছেন, 'আমার ধাতু বরাবর গাঢ় বাঙ্গালীতর। আমার কলেজে শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের ন্যায় উহা আমার প্রকৃতির উপর গাঢ় রূপে বসে নাই। আমি মধ্যে মধ্যে খানা ও মদ খাইতাম বটে কিন্তু সচরাচর প্রত্যহ দুইবেলা মাছের ঝোল ভাত না খাইলে চলিত না।'

রাজনারায়ণবাবু ঢাকায় গেছেন। অতিথি হয়েছেন আবগারী কমিশনার ডনেলে সাহেবের হেড কেবানির। ভেবেছিলেন, বাঙালি বাড়িতে বাঙালিখানা, বাঙালি লাইফস্টাইলে কিছুকাল আরামে কাটাবেন। কেরানি বন্ধুটির মোটা টাকা মাইনে। সাহেবি ধরন, সাহেবি জীবনচর্যা।

'আমার দুর্ভাগ্যবশত দেখি তিনিও টেবিল পাতিয়া ইংরাজী রকমে আহার করিতেছেন। মাছের ঝোল আর ভাতের আশায় জলাঞ্জলি।'

যে-বন্ধুর অতিথি হয়েছেন, তাঁর নাম বলেননি। 'কোডনেম'-ঈ। লিখছেন, 'অনেকদিন ইংরাজী রকমে সাবান মাখিয়া রুক্ষ স্নান করাতে অত্যন্ত গরম হওয়াতে একদিন ঈ-বাবুর চাকরকে দিয়া বাজার হইতে তৈল আনাইয়া নীচের তলায় একটি

অন্ধকার ঘরে তৈলমর্দন করিতেছিলাম। সে অন্ধকার ঘরে ঈ-বাবুর কখন আসিবার প্রয়োজন হয় নাই। সেদিন কোন প্রয়োজনবশতঃ আসাতে তৈলমর্দনরূপ অপকর্ম করিবার সময়ে তাঁহা কর্তৃক ধৃত হইলাম।'

তিনি বললেন, 'এ কি?'

সরষের তেল মেখে স্নান না করলে বাঙালির কষ্ট হয়। রুক্ষ স্নান সহ্য হয় না। রাজনারায়ণ বাবু বন্ধুকে বলেছিলেন, 'পাছে তুমি আমাকে নিতান্ত বাঙ্গালী ঠাওরাও এই জন্য বলি নাই।'

তেলচিটে বাঙালি। মেয়েদের মাথায় চ্যাপচ্যাপে নারকোল তেল। টান টান করে চুল বাঁধা। ঘাড়ের কাছে গোল খোঁপা। গোলাপেও কাঁটা। খোঁপাতেই কাঁটা। ইংরিজি 'ভি'-আকৃতির বড় বড় সেই কাঁটা, যা বাড়িময় এখানে-সেখানে ছড়িয়ে থাকত। এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। কম্পানি উঠে গেছে। সেকালের মেয়েরা একালের মেয়েদের মতো প্রেমিকের বুকে মাথা রেখে যদি ফোঁস ফোঁস করতে চাইত, তাহলে সেই দিনই প্রেম কাবার। প্রেমিকের জামার বুকে তেলের দাগ। তেলের দাগ আর লিপস্টিকের দাগে অনেক তফাত।' লিপিস্টিকের' দাগ রিয়্যাল রোমান্টিক। সেকালে সদ্য বিবাহিত যুবকের গালে, সাদা জামার কাঁধে সিঁথির সিঁদুরের দাগে ভয়ঙ্কর রকমের একটা ইঙ্গিতবহ দুষ্টু দুষ্টু ভাব থাকত। কত রকমের পশ্চাৎঘটনার সম্ভাবনা।

তিন খানা নানা সাইজের জামাই ছটা ছোট সাইজের বাঁদর নিয়ে চলে এল। শান্তি মাথায় উঠল। দক্ষযজ্ঞ। এটা লাফাচ্ছে, এটা ঝাঁপাচ্ছে। গেলাস ভাঙছে। মেয়েদের দল উদাসীন। গল গল গল্পে মশগুল। গল্পের কি শেষ আছে! মাঝে মধ্যে আদিরস আসতে পারে। পুরুষদের দুর্বলতা, হ্যাংলামি।

'কাট টু সাইজ'। 'কনভিনিয়েন্স'-এর ছুরি চালিয়ে একাল সেকালকে কেটে টুকরো টুকরো করেছে। সাফ কথা, অত সময় নেই, সহ্যশক্তি নেই, ত্যাগ নেই। ছিমছাম ফ্ল্যাট। মিনি সাইজের সংসার। কত্তা, গিন্নি আর একটা বাই প্রডাক্ট। কাজের মেয়েটি আদি রসাত্মক। সময়ে অসময়ে বাইরে থেকে সুট-সাট্ সিটি ভেসে আসে। তার সঙ্গে একটা টুল-বক্স থাকা অসম্ভব নয়। একটা ভোজালি, একটা হাতুড়ি, এক গাছা নাইলন দড়ি।

পুরনো বাড়ি ফেলে দিয়ে আমরা চললুম। প্রোমোটাররা এইবার বুঝে নিক। শিফটিং সুপারভাইজার জিজ্ঞেস করলেন, 'সব উঠেছে তো?'

'একটা বাকি আছে।'

'বাকি কেন? তুলে দিন না।'

'তোলা যাবে না ভাই। সঙ্গে যাবে। অশান্তি, ঝগড়া।'

ভারি সুন্দর, বিউটিফুল। ছবির মতো সাজানো; কিন্তু, লাইফ আছে লিভিং নেই। পরিবার আছে পরিজন নেই। এই ওপর ওপর আলগোছে, যে কোনো মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে এই রকম সম্পর্ক নিয়ে কাহিনি টেনে যাওয়া। আধুনিক শয্যায় ক্লান্ত দুই প্রাণ। মাঝখানে পড়ে আছে রাত অদৃশ্য পাশ বালিশ হয়ে। একালের গান ভাই! রান্নাঘরে চলছে ক্লোজার / রকের পাশে রোলকাউন্টার / ট্রালা লালা লা।

প্রেমের কল

ঢুকে যখন পড়েছি নাটক শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে ভাবেই হোক বেঁচে থাকতে হবে। জীবনের কারাগারে অসহায় বন্দী। এরই মধ্যে কেউ 'এ' ক্লাস প্রিজনার, কেউ অর্ডিনারি। বন্দীর ছেলে বন্দী। মুক্ত কে? যে এখনও জন্মায়নি। লাইফ ইজ এ কেজ। কেউ সোনার খাঁচায় ডিম পাড়ে, কেউ লোহার খাঁচায়। সে সোনাই হোক, আর লোহাই হোক—খাঁচা ইজ খাঁচা।

ঢুকেছ কী মরেছ। কিছুকাল বোঝা যাবে না, তখন আমাদের পৌগণ্ড অবস্থা। জ্ঞানগম্যি হয়নি। কোথায় এসেছি, কার কাছে এসেছি, ইমারতে, আটচালায়, না ফুটপাতে তাও জানি না। চুক চুক করে দুধ খাই, ঘুমোই, কাঁদি, শুয়ে শুয়েই বড় হই। হাত, পা মোটা মোটা হয়। অবশ্য যদি খেতে পাই, তা না হলে কাঠি কাঠি। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ অবশ্য গায়ে গতরে তেমন বাড়ে না। কারণ প্রোটিনের অভাব। মাথাটাই বড় হয়, মগজ বাড়ে না। আইনস্টাইন, রাসেল, ফেনম্যান, হকিং, টাইসন,

হোলিফিল্ড, সব প্রথম বিশ্বের। ওদিকে সব ছফুটের এপাশে, ওপাশে, আমাদের বিশ্বে সব পাঁচের পর যত সারই পাক আর বড় জোর ইঞ্চি চারেক। ইওরোপের প্রমাণ মাপের মানুষের পাশে আমরা বামন।

একটাই সান্ত্বনা, বড় লঙ্কার ঝাল কম, ধানি লঙ্কার ঝাল বেশি। আমাদের ঝালের ঠেলায় প্রতিবেশীরা অস্থির। আমাদের রাগের ঠেলায় পরিবার ফেটে যায়, বন্ধুরা ছিটকে পালায়, সংসার ভেঙে যায়। ঈর্ষায় ফস ফস করে মাথার চুল উঠে যায়। অবশেষে চিতল মাছের পেটের মতো নির্বান্ধব একটি টাক। আবার কৌশলের শেষ নেই। কায়দা করে পেছনের চুল টেনে এনে টাক ঢাকার কসরত, যেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। মজা এই, গোঁফ আর দাড়ি পরতে জানে না। বিশ্বজোড়া টাক, এদিকে বাদুড়ঝোলা গোঁফ। ঠোঁটের দোতলা থেকে একতলার ওপর ঝাড়ু ঝোলায়। পাকা চুলে কলপ মেরে পঞ্চাশের পরেও প্রেমিকা খুঁজি!

সমস্ত সর্বনাশের মূলে এই প্রেম। প্রেমই শিকল পরায়, সংসারে ঢোকায়। মেয়েদের সর্বনাশা মুখ, অতল চোখের আহ্বান, কপালের টিপ, সরু সরু আঙুল, ঘাড়ের পরে আলগা খোঁপা, সুরে ভরা গলা, এমন এক ফাঁদ। যৌবনের চৌকাঠ থেকে পা বাড়ালেই অনিবার্য পতন, হাবুডুবু। ভাল সাঁতারু না হলে ঢোঁকে ঢোঁকে জল গিলে জীবন সরোবরের তীরে চিৎপাত।

প্রেম এক জিনিস, সংসার আর এক জিনিস। প্রেম হল স্বপ্ন, সংসার হল দুঃস্বপ্ন। দুই হবে তিন, তিন হবে চার। তখন টাকা টাকা। তখন প্রেমিকার অন্য রূপ, সপ্তমে ঝঙ্কার—মুরোদ যদি না-ই ছিল মরদ তা হলে কেন করেছিলে সংসার! পৃথিবীতে এমন কোনো প্রেমিকা নেই যে দরিদ্র স্বামীকে বলবে, ব্যাগ ফাঁকা তো কী হয়েছে ডারলিং, মন তো ফাঁকা হয়ে যায়নি। এসো না চাঁদের আলোয় দু'জনে হাতে হাত রেকে লায়না-মজনু, হির-রানঝার কথা বলি। পৃথিবীতে একমাত্র জিনিস, যা ফ্রি পাওয়া যায় তাই ঢুকুঢুকু খাই, অর্থাৎ পানি। পানির চেয়ে উত্তম পানীয় আর কী আছে প্রিয়তম। পিঠ আর পেট পিচবোট হয়ে যাক। আমরা হাসতে হাসতে, প্রেমের জয়গান গাইতে গাইতে মরে যাই। আহা মরে যাই! এটা কী তোমার মামার বাড়ি! প্রথমে ছিল চুনকাম করা দেয়াল। যেই দুটো পয়সা হল চড়িয়ে দিলে ইমালসান পেন্ট। আরো হল। পাখার পক্ষ সাতন করে দেয়াল কেটে বসিয়ে দিলে ঠাণ্ডা বাক্স। বুকে বাসা বাঁধল শ্লেষ্মা, কণ্ঠস্বর ভারী হল। গাঁটে গাঁটে অবস্থান ধর্মঘটীদের মতো বসে পড়ল বাত। মুখেও বাত, গাঁটেও বাত। ছিল সাইকেল হল মটোর সাইকেল। বর্ষার রাস্তায় একদিন কুমড়োর ফালির মতো সড়াক। তিনমাস ট্র্যাকসান। নিজেকে আরো একটু খেলিয়ে মটোর গাড়ি। হুস করে বেরিয়ে যায়, বাবু পেছনের আসনে গম্ভীর মুখ। মটোর মুখও বলা চলে। পরিচিত জনেরা হেসে কথা বলতে গিয়ে বাবুর রং দেখে চুপ মেরে যায়। আত্মীয়-স্বজন ঘনিষ্ঠ হতে গিয়েও হয় না। গাড়ির বন্ধু পা

গাড়ি হতে পারে না। বাবু চা ছেড়ে বোতল খান, গাড়ি খায় পেটরোল। বাবুর মধ্যপ্রদেশ ফুলতে থাকে। কোমরবন্ধনীর ফুটো কমতে থাকে। চোখ দুটো ক্রমশই স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক হতে থাকে, মৃত কাতলার মতো। বাবু আর আগের মতো হাসে না, ফিক করে। বাবুর বিচরণ ক্ষেত্র আলাদা হয়ে যায়। বাবুর দু-চোখের তলায় দুটো পুঁটলি। বাবুর রক্তে চিনি দেখা দেয়। বাবুর হৃদয় থেকে থেকে হাঁসফাঁস করে। হৃদয়মাপা-যন্ত্রে ঢেউ খেলানো-লাইন। ডাক্তার বলবেন, 'কত্তা, ভোগের দুর্ভোগ বাড়িয়ে বসেছ। ওজন বেড়ে গেছে। তুমি আর মানুষ নেই। ভারবাহী পশু হয়ে গেছ। নিজের দেহভার বইতে গিয়ে নিজের হৃদযটিকে তার ক্ষমতার বেশি খাটিয়ে ফেলেছ! রক্তে চর্বি ঢুকিয়ে বসে আছ। ঘনত্ব বেড়ে গেছে। নিজেকে এইবার একটু খাটাও। হাঁটাচলা করো। বড়লোক হলেও প্রাণের দায়ে নিজেকে গরিব ভাবো। গরিবের খাদ্য খাও। তিন কদম হাঁটতে গলদঘর্ম হলেও হাঁটো।

একদিন দেখা গেল, বাবু গাড়ি ঠেলছেন। জনে জনে প্রশ্ন, 'কী হল সাহেব!'

জানলা দিয়ে মুখ বের করে জবাব দিলেন, 'একে বলে, সেল্‌ফকে হেল্প করা, সেল্‌ফ হেল্প। গাড়ির সেল্‌ফ ফেঁসে গেছে, এখন ওঁর ঘামের সঙ্গে মেদ ঝরছে। তিরিশ কেজি ওজন না কমালে বিপদ আছে।' স্বামীকে বললেন, 'ঠ্যালো, ঠ্যালো, ফুর্তিসে ঠ্যালো। গাড়ি এখন আর হর্সপাওয়ারে চলবে না, ম্যানপাওয়ারে চলবে।'

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে বাবু তখন জেগে বসে থাকেন। দেখেন নিশ্চিন্ত মানুষ কেমন অকাতরে ঘুমোয়! তার কেন ঘুম আসে না। ধাপে ধাপে অনেকটা উঠে পড়েছেন। জীবনযাত্রার মানের মই। এ ওঠা বড় মজার। শেষে কোনো ছাত নেই। ধাপে ধাপে শুধুই ওঠা। ঝুলে থাকা। মুঠো আলগা হলেই খসে পড়া। এ এমন এক খেলা, সাফল্যে হাততালি নেই, পতনেই হাততালি।

'কীগো, এখনো ঘুমোও নি, আমার তোফা এক রাউন্ড হয়ে গেল। তোমার কীসের এত দুশ্চিন্তা!'

'তুমি আর বুঝবে কী! তোমরা তো আরোহী। ঠেলছি আমি। গাড়ির ব্যাটারি পাল্টানো যায়, মানুষের ব্যাটারি ভোলটেজ মেরে একবারই ছাড়া হয় ওয়ার্কশপ থেকে। তারপর ডাউন, ডাউন, ডাউন, নিল ডাউন, ডাউন টু আর্থ! ধুলার শরীর ধুলাতেই মিশায়। ঘুম কেন আসে না! মুঠো আলগা হয়ে আসছে। ভয়! ভীষণ আতঙ্ক, মরার আগেই যদি মই থেকে পড়ে যাই! ধরিত্রী ছাড়া কে আর কোল দেবে!

বর এসেছে, বর এসেছে, বরণ করো, বরণ করো

বর এসেছে, বর এসেছে টোপর মাথায় দিয়ে। জোড়া জোড়া শাঁখ, 'ফেরোসাস' উলু। একালের নয়, সেকালের বিবাহ চিত্র। ঘটক অথবা ঘটকী তাঁরাই ছিলেন 'ম্যাচমেকারস'।

আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথেব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেযু পরিবর্তশ্চতুর্বিধ।।

আদান শব্দের অর্থ, সমান, সমান অথবা উৎকৃষ্ট ঘর থেকে কন্যা গ্রহণ ; প্রদান অর্থাৎ, সমান অথবা উৎকৃষ্ট ঘরে কন্যা দান। কুশ ত্যাগ—অতীতের অদ্ভুত এক প্রথা—উভয়পক্ষে উপযুক্ত কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যা গ্রহণ, অথবা দান। ঘটক উপস্থিত থাকবেন। তাঁর সামনে প্রতিজ্ঞা করে এই অদ্ভুত বিবাহ হবে। কারণ অতীতে পুরুষ বিয়ে না করলে পাপ হত। দশবিধ সংস্কারের একটি হল বিবাহ। বিবাহ না করলে পবিত্র হওয়া যায় না, ধর্মে অধিকার থাকে না। পৃথিবীর সব ধর্মশাস্ত্রে এই কথা বলা আছে।

সে এক সময় ছিল, যখন ঘটকদের রমরমা। এখন ঘটকের কাজ করছে সংবাদপত্র। পাতার পর পাতা বিজ্ঞাপনে হাজার হাজার পাত্র-পাত্রী। বক্স নম্বরের বাক্সে বসে আছে বিয়ে সেজেগুজে। সে সময় প্রায় সব বিয়েই হত সম্বন্ধ করে। পাত্রপক্ষ, কন্যাপক্ষ। প্রবাদই ছিল—হাজার কথা না হলে বিয়ে হয় না। মেয়ে-দেখা ভীষণ একটা খুঁতখুঁতে ব্যাপার ছিল। সমর্থন করা যায় না।

অপমানজনক, বিরক্তিকর, হ্যারাসমেন্ট। সেকালে মেয়েদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। এ-কথা সময় থেকে অনেকটা সরে এসে আমরা বলছি। সেকালে এইটাই

ছিল প্রথা। এর মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনা ছিল, রোমাঞ্চ ছিল। মেয়েদের বিয়ে হত অল্প বয়সে। স্বপ্ন দেখার কালে। বহু পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে একটিকে গ্রহণ খুব গোলমেলে ব্যাপার। মন বসানো মুশকিল। যা হবে তা একবারই হবে। চিরকালের বন্ধন। অলৌকিক বন্ধন। দুটি প্রাণের এক হয়ে যাওয়া—মিলন। বহু বিবাহ থেকে এক বিবাহে আমার পর মানুষ পরিবারের মাধুর্য বুঝতে পেরেছিল। বিয়ের পিঁড়েতে বসে মন্ত্রে মন্ত্রে খুঁজে পেত পরিণয়ের পবিত্রতা, রোমাঞ্চ।

পুরোহিতের নির্দেশে, কন্যার দক্ষিণ করতল বর নিজের দক্ষিণ হস্তে চিত করে ধরবেন। কোন পতি অথবা পুত্রবতী নারী কিংবা পুরোহিত ওই হাতের উপর পাঁচ ফল বাঁধা গামছা রেখে, বর কন্যার হাত কুশ আর ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে ঘটের ওপর রাখবেন। যিনি সম্প্রদান করছেন, তিনি বাঁ হাত দিয়ে কন্যার উত্তরীয় ধরে ত্রিপদ দিয়ে গঙ্গার জল ছেটাতে ছেটাতে বলবেন, ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্রায়ৈ সালঙ্কারায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ। পাঁচটি ফল হল আমাদের জীবনের সেই পাঁচটি চাওয়া, ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, মুক্তি। কন্যাটি তোমাকে দেওয়া হল, গ্রহণ করো—সবস্ত্রাং সালঙ্কারাং প্রজাপতিদেবতা কামর্চিতামনাং কন্যাং ভুজ্যমহং সম্প্রদদে। এরপর কামস্তুতি পাঠ

ওঁ ক ইদং কস্মা আদৎ কামঃ কাময়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা — তোমার কামিনী নিয়ে যাও তোমার জীবনে, পরিবারে। পতিপুত্রবতী স্ত্রী অথবা পুরোহিত এইবার গাঁট ছড়া বেঁধে দেবেন। এইবার একটি চাদরের আচ্ছাদনে শুভদৃষ্টি। তারপর বাসরে গমন। শুরু হল দাম্পত্য জীবন—till death do us apart। ইংরেজি প্রবাদে কিঞ্চিৎ রসিকতা wedlock a padlock. সপ্তপদী এক অসাধারণ অনুষ্ঠান। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনু চিত্তং তেহস্তু।

প্রথমে বিবাহ। তারপর মিলন। প্রেম, ভালবাসা, হাত ধরে পথচলা। 'বিধাতার মহাকাব্য তুমি,/সসীমে অসীমে সম্মিলনী // একালে উল্টে গেছে। আছে প্রেম। প্রেমের মড়ক লেগেছে। ফোনে প্রেম, দোকানে, বাসে, বিমানে, শ্মশানে, ইন্টারনেটে। সম্বন্ধ করে বিয়ে হলেও ছেলে বলবে সাতদিন একান্তে মেয়েটিকে দেখব। বাজিয়ে নেবো। যেমন, মাটির হাঁড়ি কেনার আগে 'টাং, টাং' করে বাজিয়ে নেওয়া।

টোপর মাথায় শঙ্খ আর উলুতে যাবতীয় প্রথা মেনে বিবাহ মোটামুটি বাতিল। বিয়ের পর বর কন্যার দক্ষিণপদ ধরে দাম্পত্য পথে প্রথম পদক্ষেপ করাচ্ছে, সপ্তপদীর সপ্তমণ্ডলে সাবধানে একটি একটি করে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়া। ডান পা এগোচ্ছে বাঁ পা স্পর্শ করে আস্তে ছেড়ে আসা মণ্ডলটি। ভঙ্গিটি অনুমান করা যেতে পারে। দু'জনের যাত্রাপথ। কেউ থাকবে না সঙ্গে এই দুঃখ সুখের যাত্রাপথে। সাতটি মণ্ডল পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্রের সাতটি ভুবন—ভু,ভুব, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপ আর সত্য।

একালের বিয়ে চটজলদি। চলে এস। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার। সই, সাক্ষী, রেস্তোরা, টিটবিটস, পার্টি। বিয়ে না করে একসঙ্গে কিছুদিন থাকাও যেতে পারে। নিৎসের সাবধানবাণী--বিয়ের আগে প্রশ্ন কোরো—

Do you believe that you will be able to converse well with this woman into your old age

কাগজে কলমে

গেল, গেল, গেল, গেল।

মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্য অনেক রোগের মতো এটিও একটি রোগ। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকো আর থেকে থেকে 'গেল গেল' করো। একে বলে 'গেল, গেল' সিনড্রোম। মধ্যবিত্তের সমাজ দর্পণ হল সংবাদপত্র। বাঙলা খবরের কাগজ। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আঁকুপাঁকু—পেপার আসেনি? কেউ বলেন, 'পেপার', কেউ বলেন কাগজ। দোতলা থেকে চিৎকার, 'কাগজ আসেনি এখনো! নাঃ, এটাকে ছাড়াতে হবে। সব বাড়িতে কাগজ পড়ে পুরনো হয়ে গেল।'

বাঙালি কাগজ বাঙালির মতোই। বেশির ভাগ অংশেই রাজনীতির 'কাবাডি' খেলা। 'এই ছাড়লুম, এই ছাড়লুম।' 'এই ভাঙলুম, এই তুবড়ে দিলুম।' যাঁদের বলা হচ্ছে, তাঁদের হৃষ্টপুষ্ট, সুখী সুখী মুখে কোনো উদ্বেগ নেই। কারণ, ক্ষমতা মানুষকে এমন একটা হাইটে তুলে দেয়, যে হাইটে উঠলে নিচের দিকের সমস্ত কিছু ছোট ছোট দেখায়।

বাসের ফুটবোর্ডের মতো রাজনীতির ফুটবোর্ডে যাঁরা ঝুলছেন, তাঁদের দেখে আমরাই 'গেল, গেল' করে মরি। যাঁরা স্বাধীনতার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, প্রাণ দিয়েছিলেন, সাতচল্লিশের পর কয়েক বছর তাঁদের স্মরণে রাখার চেষ্টা হয়েছিল, তার পর একটা স্ট্যাম্প মারা হল 'ফ্রিডাম ফাইটার' কী সম্মান! ট্রেনে ফ্রি-পাস। একটা ছাপ-মারা কাগজ। কয়েকশো টাকা পেনসান। সেটি আবার আদায়

করতে গিয়ে মনে হল, এর চেয়ে ইংরেজের হাত থেকে ফ্রি-ডাম আদায় করা অনেক সহজ ছিল। যৌবনে যাঁরা বলতেন 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' তাঁরা সব 'ডাম্পিং গ্রাউন্ডে' চলে গেলেন। চলে গেলেন ব্যাক স্টেজে কালো পর্দার অন্তরালে। ব্রিটিশ যাঁদের কিছু করতে পারেনি, স্বাধীন ভারতের অবহেলা আর দারিদ্র্যে প্রায় সবাই বিদায় নিলেন। ওপর থেকে তাঁরা পুষ্পবৃষ্টি করছেন। নিচের অন্ধকার তলা জেগে উঠেছে। মহল্লায় প্রবল প্রতাপান্বিত হাতকাটা হাবু। কানকাটা কালুরা চৌকি খুলেছে। দেড় ব্যাটারি চোখে যখন তাকায় হাড় হিম হয়ে যায়। পুজো চড়াচ্ছেন পূজারীরা। কেউ ভাড়াটে ওঠাবেন, কেউ প্রোমোটারি করবেন। কেউ করবেন গণতন্ত্র।

ভারতের আকাশে 'কালাচাঁদের' উদয়। সাতচল্লিশে স্বাধীন। হাতে হাতে সাতচল্লিশ। এ. কে. ফর্টি সেভেন। বাংলায় 'অদ্ভুত-কলাকার সাতচল্লিশ'। এই এ. কে. সাতচল্লিশের অসীম কৃপা! সেকেন্ডে তিরিশ জনকে স্বর্গে পাঠাতে পারে। সব 'বাদ' বরবাদ। শ্রেষ্ঠ বাদ 'সন্ত্রাসবাদ'। মাল্টিন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি। এমন দিন আসবে, দশকর্মাভাণ্ডারে ধুনোর পাশাপাশি, 'আর ডি এক্স' কিনতে পাওয়া যাবে।

এই! একেই বলে মধ্যবিত্ত 'সিনড্রোম'। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের লক্ষণক্রান্ত। যা হয়নি, যা হবে তাই ভাবা! যখন হবে, তখন হবে। অ্যামনেও মরবে অমনেও মরবে। বাঘ মারা বন্ধ। নিরীহ হরিণ মারা যাবে না। ধরা পড়লেই পুলিস-কেস। নামী চিত্রতারকারও নিস্তার নেই। এত ভাল ভাল আধুনিক বন্দুক তৈরি হয়েছে, বিস্ফোরক তৈরি হয়েছে। সে-সব যাবে কোথায়! বাঘের চেয়ে মানুষের সংখ্যা বেশি। থইথই মানুষ। ধেই ধেই মানুষ। কত মানুষ বোজাবার জন্যে 'পালক' যাঁরা তাঁরা মাঝে মাঝে মিছিল বের করেন। পাশে পাশে চলেন ছড়িদার। সবই মিছিলই মহামিছিল। কাঁচা কাঁচা মানুষ মারায় তো কোনো আপত্তি নেই। সেকেন্ডে তিনটে করে জন্মাচ্ছে। একশো হয়ে যাচ্ছে তিনশো। এত মানুষকে রাখা যাবে কোথায়? এ তো বই নয়, যে তাকে তুলে রাখা হল খাড়া করে। পুরনো বই যেমন ঝুর ঝুরে, ফুটো ফুটো, সেই রকম গ্র্যান্ডফাদার, পাশে ফাদার, গোটা পরিবার তাকে তোলা রইল। সে উপায় নেই। জ্ঞানগর্ভ, হাত, পা সমেত। হেরে রে রে।

আগে আড়ং ধোলাই খেত কস্তাপাড় ধুতি, এখন ধোলাই, গণধোলাই ইত্যাদির সুচারু ব্যবস্থা সর্বত্র। আপাত নিরীহ খাঁটি চারপাশে। চাক ভাঙা মৌমাছির মতো সব বেরিয়ে আসবে। অমৃতের পুত্রের অমৃত হরণ করে নিমেষে হাওয়া। চলে যাও লাশ-কাটা ঘরে। ছিলে 'অমৃতস্য পুত্র'— হয়ে গেলে বেওয়ারিশ লাশ। আর মনে রাখতে হবে গণধোলাই যাঁরা লাভ করেন তাঁরা সবাই নিকৃষ্ট টাইপের অপরাধী। পুলিসের খাতায় রগ-রগে যত অপরাধ আছে সবই সেই ভাগ্যবানের ঘাড়ে চাপানো হবে। ছাত্রকে শাসন করেছিলেন সেকেলে ধরনের ছাত্র-অন্ত-প্রাণ কোনো শিক্ষক। মহল্লার প্যারালাল আদালতে বিচার হল। জজসাহেব ট্যারা পঞ্চা রায় দিলেন,

'ব্যাটাকে একালের মতো করে একটু বানিয়ে দাও। হার্টের অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি মুখ থুবড়ে পড়লেন। গণতন্ত্রের চাপ সহ্য হল না। দেশে শিক্ষকের অভাব নেই। একজন 'মিসফিট' চলে গেলেন ত কী হল! সিস্টেমে ফিট করবেন এইরকম একজন আসবেন। ছাত্রদের স্বভাব জানতে হবে। মধ্যযুগের কায়দায় 'চরিত্র, চরিত্র' বলে আদিখ্যেতা করলে ওপরের পাঠশালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ছাত্র ইজ ছাত্র। 'র‍্যাগিং', 'ইভটিজিং' 'বারোয়ারি', কে করবে? তাদের ফাদার? ফাদার 'ফডার' জোগাড়ের ধান্দায় 'বোথ হ্যান্ডে' ফিল্‌ডিং করবেন। আধুনিকা মাদার মেয়েকে মিস আর্থ, ওয়াল্‌ড, ইউনিভার্স' যে-কোনো একটা করার জন্যে 'টিভি-পাঠ' নেবেন। নিদেন সিরিয়াল নায়িকা। ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে রাখবে টানা তিনদিন। ডিহাইড্রেশনে তিনি শমন সদনে গেলে যাবেন। নো হেল্প। ছাত্র আর ছাত্র রাজনীতি স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে একটা পাওয়ারফুল ফোর্স। কপালে দইয়ের ফোঁটা পরে বলির পাঁঠার মতো পরীক্ষার হলে যাওয়ার দিন শেষ। সব রকম পাপের পাঠ নিতে হবে। আন্ডার ওয়ার্লডের 'ম্যান হোল'-এর ঢাকনা খুলতে হবে।

ডাক্তারবাবুকে ট্রেনে পিটিয়েছে। গেল গেল করার কী আছে? বাঘ চেনেন, সাপ চেনেন, ডেলি প্যাসেঞ্জারদের চেনেন না। একটা আলাদা ফোর্স। দেশের এই সুদিনে এঁরা কত ভাগ্যবান! দেশ থেকে জীবিকারা প্রায় প্রস্থান করেছে। যে-কটা আছে সার্কাস-সুন্দরীদের মতো ঝোলা দড়িতে ব্যালেন্‌সের খেলা দেখাচ্ছে। হলদিয়ায় রোজই নতুন নতুন চ্যাপ্টার খোলা হচ্ছে। টান টান সিরিয়াল। বড় বড় ব্যাঙ্ক এক সময় কর্মচারীতে গিজ গিজ করত। মোটা মোটা মাইনে। চকচকে চেহারা। রুক্ষ্ম বচন, তীব্র শাসন। টাকা জমা অথবা তোলার মতো নীচ কাজ করতে এসেছেন! চুপ করে খাড়া থাকুন। খেল খতম। 'ভি আর এস' এসে গেল। গো হোম। ব্যাঙ্ক হয়ে গেল রেফ্রিজারেটারের মতো ছোট্ট একটা বাক্স। একা রাত জাগে একজন কর্মী। কার্ড ঢোকাও মাল নিয়ে বাড়ি যাও।

এই অবস্থায় এখনো যাঁরা চাকরি বাকরি করছেন 'ডেলি' শহরে আসছেন তাঁদের খাতির না করলে ধোলাই তো খেতেই হবে। তাঁরা তাস খেলবেন না? রোজ খেলবেন। তাসের মতো জিনিস আছে। যে-প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে তার সামনে তাস বসেছে। টিকিটধারী যাত্রীকে পিটিয়ে তুলে দিয়ে তাস চলছে। এইবার দুশো বছরের রেল-ব্যবস্থা টুকরো টুকরো হবে। আন্দোলনের কত বড় 'স্কোপ'। এও তো তাস খেলা!

'কেমন আছেন তাহলে?' 'কী বলব ভাই! ল্যাজে গোবরে অবস্থা।' 'আছেন কেন!'

'মধ্যবিত্ত যে সহজে মরে না। দে আর লাইক আরশোলা!'
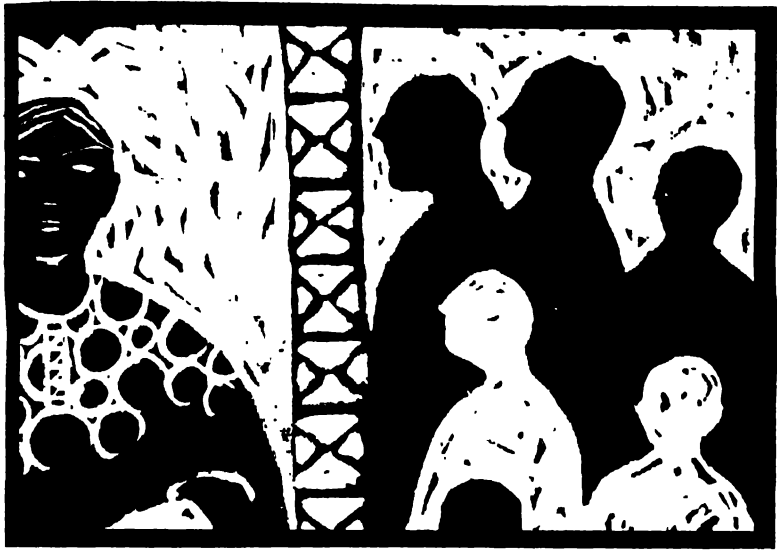
ক্যাঁচ-কোঁচ

এই তো চারটে দিন। পুজো আসছে, পুজো আসছে, এসে গেলেই হয়ে গেল।

আর আমাদের এই বাহুল্যবর্জিত, ডানা কাটা ফ্ল্যাট জীবনে পুজো এলেই বা কী, আর পুজো গেলেই বা কী! কবি, তুমি কী বলো?

এ কী রকম জানো, টান টান করে পাতা বিছানার চাদর। শোয়া-বসার ফলে একটু কুঁচকে-মুচকে গেল। হাত বুলিয়ে দাও। আবার টান টান। টান টান, টানাটানির জীবনে পুজো হল একটু কোঁচ। গরুর গাড়ির চাকোয় দুটো শব্দ ক্যাঁচ-কোঁচ। দৈনন্দিন হল—ক্যাঁচ। উৎসবের দিন হল—কোঁচ। ক্যাঁচের পর কোঁচ, কোঁচের পর ক্যাঁচ।

পারোও বটে, এই জন্যেই তুমি কবি। একটা সামান্য জিনিসকে প্রায় মাইলখানেক লম্বা করে ফেললে।

দেখ ইল্যাস্টিক যখন স্টিক হারায়, তখন অটোমেটিক লম্বা হয়ে যায়। গত পুজোয় শখ করে একটা কোরা গেঞ্জি কিনেছিলুম, সিল্ক সিল্ক দেখতে। বেশ ভাল দাম। সেটা ঝুলতে ঝুলতে, লম্বা হতে হতে নাইটি হয়ে গেছে। বউকে দিয়ে দিয়েছি—সিঙ্গাপুরী সারং। দোকানে গিয়ে বললুম। অবাঙালি দোকানদার বললেন, গেঞ্জির কোনো দোষ নেই, দোষ আপনার। গেঞ্জির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে পারেননি। কো-অপারেশনের অভাব। বললুম, আমি আর কী করে বাড়ব ভাই! পাঁচ ফুট ন'ইঞ্চিতে চিরজীবনের মতো নাটবল্টু ফিক্সড।

দোকানদার বললেন, ভারতবর্ষে কোন স্টেট সবচেয়ে বড়? মধ্যপ্রদেশ। রোজ একটু একটু করে ভুঁড়ি বাড়াতে হবে। চুড়িদার পাজামার মতো এ হল ভুঁড়িদার গেঞ্জি। বাড়ার শক্তি দেওয়া আছে।

তা কবি, তুমি একটু মোটা হওয়ার চেষ্টা করো না। তোমার এই বাঁশপাতার মতো একহারা চেহারা, সেই কবে থেকে দেখছি। লেংথ উইদাউট ব্রেড্থ, লাইক এ টুথ পিক।

পঁচাত্তর টাকা পিস।

তার মানে?

এক পিস কবিতা যদি কোথাও প্রকাশিত হয় তাহলে ছ'মাস পরে একটা পঁচাত্তর টাকার চেক আসে। তা ছাড়া কবিদের চেহারা যদি অ্যামেরিকান ফ্রি-স্টাইল কুস্তিগিরদের মতো হয়, মানায় না। কালিদাস, জয়দেবের চেহারাটা একবার কল্পনা কর। শীর্ণ, বিরহকাতর। প্রেমিকা প্রোমোটারের মটোর বাইকের পেছনে চেপে স্কচ ভুঁড়ি জাপটে ধরে কোনো রিসর্টে চলে গেছে ভয়ংকর অভিসারে। কাগজে পাতা আছে কবির অক্ষরের রেল লাইন, প্রেমের রেলগাড়ি সে লাইনে আর এল না, মিলনের ছোট্ট নির্জন স্টেশনে।

কিন্তু ভীষণ মোটা মোটা কবি আমি দেখেছি। তিন তিসি, লোটা গর্দান। মঞ্চে যখন কবিতা বলতে ওঠেন মঞ্চ মচমচ শব্দ করে।

তেনারা কেউ বিশুদ্ধ কবি নন, গদ্যের লাইন ধরে নিয়েছেন। উপন্যাসের দক্ষিণা অনেক বেশি। পার স্লিপ পাঁচশো। পুজোর মরসুমে যা কামিয়ে নেন তাইতেই সারা বছর সপরিবারে হুইস্কি আর চিলি চিকেনে থাকেন। কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে লেখা বের করেন। পুজোর মুখে দু দিকে দুটো জিনিস ওঠে। বছুরে ফসল। হরিপালে আলু আর এদিকে পুজো সাহিত্য।

এসো, এসো। আমাদের ইন্দ্রনারায়ণ। ব্যাটা, এখানে লেখা-পড়া করে আমেরিকা পালিয়েছে। বুড়ো-বুড়ি বাড়ি আগলাচ্ছে। সন্তান বলতে, একটি প্রবীণ অ্যালসেশিয়ান। ছেলের স্বার্থপরতায় ক্ষিপ্ত হয়ে কুকুরকে ইন্দ্র বলে ডাকেন। ছেলে কলকাতায় এসে শ্বশুরবাড়িতে ওঠে। কমফার্টেব্‌ল। কলকাতার 'পশ' এলাকায় 'মডার্ন' বাড়ি। 'অল ফাউন্ড, অল মার্বেল'। একটি মাত্র মেয়ে। শাশুড়ি মোস্ট মডার্ন। অতীতের নায়িকা। কয়েকটা ছবি করেছেন। এক ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট রুপোলি আকাশ থেকে খসিয়ে এনেছিলেন। এই রত্নটি সহ্য হল না। তারকাটিকে মাটিতে রেখে তিনি উঠে গেলেন আকাশে। সেখান থেকে 'ড্যাবা ড্যাবা' তারার চোখে তাকিয়ে আছেন হয়ত। রোহিণীর খেলা দেখছেন।

ইন্দ্র ধপাস করে বসে খুব আহ্লাদের ভাবে বললে, 'ডিভোর্স' হয়ে গেল! আমি এখন মুক্ত, মুক্ত, মুক্ত।

ছেলেবেলার ঘুড়ি ওড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ঘুড়ি অনেক দূর বেড়েছি, নীল আকাশে লাট খাচ্ছে, হঠাৎ হাতের কাছ থেকে ভরা সুতোয় উপড়ে গেল। হাতে লাটাই। টান নেই। সুতো ঝুলে গেল। বুক খালি। আমার হাতের ঘুড়ি ক্রমশ দূর থেকে দূরে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। ইন্দ্রর মন বুঝতে পারছি। শূন্যতার ধাক্কা। গুলির চেয়ে সাংঘাতিক।

এই রকম একটা প্রসঙ্গ নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। আমাদের কবিও বুদ্ধিমান। কবির হৃদয়। বিচ্ছেদ বেদনা বোঝে। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্যে বললে, মাছের আঁশ দিয়ে মা দুর্গা তৈরি হচ্ছে।

সে কি, অশাস্ত্রীয়। বিশ্রী গন্ধ বেরবে!

কেমিকেল ট্রিটমেন্ট করে গন্ধ মেরে দেবে। থিমটা হল, জয়বাবা ফেলুনাথ। গণেশ থাকবেন সিংহের টাকরায়। অসুর হল মেঘরাজ মগনলাল।

নাঃ, ইন্দ্র জিনিসটা ‘ক্যাচ’ করল না। কবি তখন বললে, পুজোর জুতো মারা শুরু হয়ে গেছে।

সে আবার কী?

যে কোনো কাগজ খোলো। প্রত্যেকটার পেছনে ফুলপেজ জুতো। হরেক রকমের জুতো। এই জুতো বাঙালি খেত। যে-জুতো একজন মহান বাঙালি সায়েবদের খাওয়াতেন, সেই বিদ্যাসাগরের চটি আমরা বিদায় করে দিয়েছি। বিদ্যাসাগর মশাই সদর্পে বলতেন, এমন কোনো বড়লোক নেই, বেচাল দেখলে যার নাকের ডগায় আমার এই চটিটা ঘষে দিতে না পারি।

নাঃ, তাও হল না। কোনো রকমের রসিকতাই ইন্দ্রকে স্পর্শ করছে না। হঠাৎ বললে, বুঝলি, একটা রিয়েলাইজেশন হল, বউ পুরনো হয়ে যায়, মা-বাবা চির নতুন। আনকন্ডিশানাল লাভ। ছেলেবেলায় কেটেকুটে ফিরে এলে মা মলম লাগিয়ে দিতেন। আমার এই ক্ষতবিক্ষত মনে স্বার্থপর শয়তানদের মা, বাবা হওয়ার অধিকাব নেই। বাবা আর মাকে নিয়ে রাজস্থান যাচ্ছি। মায়ের খুব বৃন্দাবন দেখার ইচ্ছে, ফেরার পথে বৃন্দাবন হয়ে আসব। বিশ্বাস করো, আমার আকাশ আবার আমি ফিরে পেয়েছি। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু দ্যাট গ্রেট লেডি। সে ওয়াক আউট না করলে এক বিগতযৌবনা অভিনেত্রী আর তার কন্যার দাসত্ব করে জীবন কাটাতে হত। মনোজকুমার এলেন। লাফিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। ঢুকেই বললে, হাসছিস তো?

না।

কেন, বন্ধ করলি কেন?

পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক হঠাৎ মারা গেলেন। বাড়িতে হাসি চলবে না ভাই। মনোজ বললে, ক্লাবে চলে আয়। সবাই এক সঙ্গে হাসব। নিমপাতার শরবত খেয়ে।

ইন্দ্র বললে, তোমাদের লাফিং ক্লাবে ভাগ্যের হাসির নমুনা মিলবে?

ভাগ্য অদৃশ্যে বসে নীরবে হাসে। সে হাসির নমুনা মানুষের জীবন। কান্নটাও ভাগ্যের হাসি।

আর সাপের হাসি? যা বেদেয় চেনে?

সাপ না খেলালে সে হাসি দেখা যায় না। কিছু হাসি শোনার, কিছু হাসি শুধু দেখার। ভগবানও হাসছেন, শয়তানও হাসছেন। বিদ্যুতের ঝিলিক মারা হাসি দেখে গর্জন করে ওঠে মেঘ।

ইন্দ্রকে বলা হল, দুপুরের খাওয়াটা আজ এখানেই যদি হয়। আপত্তি আছে? আজ একটি ইলিশ এসেছেন গঙ্গা স্নান করে। নানা ভাবে সাজানো হচ্ছে তাঁকে। সরষে বাটা, নারকোল বাটার অঙ্গরাগ চাপিয়ে, কচি কলাপাতায় মুড়ে মৃদু আঁচে তিনি এখন শীতের রোদ পোহাচ্ছেন যেন!

ইন্দ্র বললে, আমাদের ঠাকুরঘরে সিংহাসনে গোপাল। আমাদের পরিবারে অনেকদিন আছেন। মা রোজ একটি করে সরের নাড়ু তৈরি করে গোপালের হাতে দেন। ছেলেবেলায় মা সকলকে বলতেন আমার দুটো গোপাল। যে গোপাল পালিয়েছিল সেটা আবার ফিরে এসেছে। এতক্ষণে বাবার স্নান হয়ে গেছে। সামনে সিঁথি করে চুল আঁচড়াচ্ছেন। চোখে গোল চশমা। গোল গলা পাঞ্জাবি। কালো পাড় ধুতি। অনেকদিন পরে বাবা হাসি ফিরে পেয়েছেন, ফিরে পেয়েছেন আমার অতীতের মাকে। চওড়া লালপাড় শাড়ি। পিঠে লুটিয়ে আছে ভিজে এলো চুল। সিঁথিতে সিঁদুর। আমি শুনতে পাচ্ছি, বাবা বলছেন, ছেলেটা গেল কোথায়? বেলা হল। আমি আর একদিন খাব ভাই! শোনো লাফিং বাবা, জীবন কাঁদাবে, জীবন হাসাবে। শব্দে হাসি নেই, হাসি আছে নিঃশব্দ সুখে। আমাদের কবি জানে!

উদারতা

কে উদার?

চাইলেই যাঁর কাছে পাওয়া যায়।

বড় বিপদে পড়েছি কাকাবাবু।

যাঁরা দান করেন, সাহায্য করেন, তাঁরা তো দাতা। সাহায্যকারী। পরোপকারী। উদারতা হল মানুষের মনের একটা অবস্থা। একই লুচি। একই উপাদানে তৈরি। কোনোটা ফুলকো, কোনোটা চ্যাপ্টা। ফুলকো মনের মানুষকেই বোধ হয় উদার বলা যায়। ভেতরে অনেকটা বাতাস থাকবে। পরিসর থাকবে। ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জানলা-দরজা বন্ধ ঘর, আর খোলামেলা ঘর।

উদারের বিপরীত শব্দ সঙ্কীর্ণ। যাঁর টাকা আছে, তিনি দান করতেই পারেন। 'ট্যাক্স রিলিফ' পাওয়া যায় বলে অনেক ধনী অকাতরে দান করেন। ইংরেজিতে বলবে, 'চ্যারিটি'। মন্দির করে দিচ্ছেন, দাতব্য চিকিৎসালয়। প্রাইমারি স্কুল। নাম হচ্ছে। লোকে দাতা বলছে। বেশ একটা সুখ সুখ ভাব। এই সব মানুষ ব্রিটিশ আমলে 'রায় বাহাদুর' খেতাব পেতেন। বিপন্ন মানুষের জন্যে তাঁদের বুক ফেটে যেত না। গরিবদের তাঁরা ঘৃণা করতেন। নিম্নবর্ণের মানুষদের বলতেন, ছোটলোক।

দয়ার সাগর একজনই ছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র। আর একজন দেশবন্ধু। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। এঁরা দিয়েই ফতুর, গোপনে দান। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন সায়াহ্নের একটি ঘটনা। অনেক ঘটনার একটি। দান, সেবা, উপকারের প্রতিদানে কিছুই পাননি। পেয়েছেন শত্রুতা, সমালোচনা, মামলা-মোকদ্দমা। বীরসিংহ গ্রামের পৈতৃক বাসভবনটি

পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গ্রামের মানুষ বিদ্যাসাগর মশাইকে বললেন, এইবার একটা পাকা বাড়ি করে ফেলুন। ঈশ্বরচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, 'গরিব বামুনের ছেলের পাকা বাড়ি? লোকে শুনলে হাসবে যে। কোনো রকমে মাথা গোঁজবার একটু স্থান হলেই হবে।'

মাকে বললেন, সবই তো শেষ হল। তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় চলো। বিদ্যাসাগর জননী বললেন, তা কী করে হয়? যে জায়গায় আমি এতকাল রয়েছি, দুঃখ-কষ্টে পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, ছাত্রদের বিপদ আর ক্লেশের সময় আগলাচ্ছি। অতিথি অভ্যাগতদের পরিচর্যা করছি—এইসব দায়িত্ব ছেড়ে কলকাতায় যাব কী করে?

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের জীবনী লিখতে বসিনি। একালের মানুষের মনোবৃত্তি, নতুন জীবনদর্শন পাশে ফেলতে চাইছি। একালের কথা হল—তুমি দুঃখে আছ, তা থাকো। আমি কেন সুখে থাকব না? চারপাশে ঝুপড়ি, ছেঁড়া কাঁথার ঝলঝলে সংসার, তার মাঝে ঝকঝকে একটি সুবৃহৎ বাড়ি। দরজায় গাড়ি বাঁধা। ভেতরে ধুমধাম। ভুরু কোঁচকানো ভারী চেহারার লোকজনের আনাগোনা। বস্তিটা হল 'ন্যুইসেন্‌স'। তবে কি জানো, কাজের লোকের অভাব নেই। সেই ব্যাপারে আমরা ফরচুনেট।

আহা 'ফরচুনের' কি ছিরি!

স্বাধীনতা প্রবীণ হয়ে গেল, এই মানুষদের এক-দু ধাপ ওপরে তোলার চেষ্টা করলে হয় না?

ডোন্ট বি সিলি! আমরা বিদ্যাসাগরও নই, বিবেকানন্দও নই। ও সব আদিখ্যেতা এ-কালে চলে না।

ওই যে বলেছিল, ক্লাসলেস সোসাইটি হবে!

যে বলেছিল তার কাছে যাও।

উদারতা আর প্রতিযোগিতা পাশাপাশি থাকে কী করে? এ কি সোনার পাথরবাটি! যে দেশে অতীত থেকে তাড়া করে আসছে একটি কথা—'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' সে দেশে উদারতা? কুঁজো ব্যক্তি কখনো চিত হয়ে শুতে পারবে! শুলেও ডোঙা-থালার মতো বন বন ঘুরবে। একালের সদা উদ্বিগ্ন যুবকের একটিই চিন্তা, 'কেরিয়ার'। যেমন-তেমন হলে চলবে না, প্রচুর টাকা রোজগারের সুযোগ চাই। ছুটছে আর বলছে—টাকা, টাকা। সৎপথ, অসৎ পথ, নো ম্যাটার, বস্তা, বস্তা, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা।

টাকার কদর চিরকালই ছিল। তবে এ কথাও ছিল—বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। শিক্ষা এবং জ্ঞান মানুষকে উদার করে, আদরণীয় করে। সঙ্কীর্ণতাকে খুলে দেয়। ভেতরের আকাশটাকে বড় করে দেয়। উদারতা হল একটা 'প্রিজম'-এর মতো। তার অনেক কোণ, যেমন—দয়া, মায়া, সেবা, সংবেদনশীলতা, প্রেম, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, সহমর্মিতা। শুধু দান নয় গ্রহণও একটা গুণ। অন্যের ধর্ম, মত, পথ, বক্তব্য চিন্তাভাবনা গ্রহণ করাটাও উদারতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সুন্দর বিশেষণ ব্যবহার করতেন, 'মতুয়ার বুদ্ধি'। যার ইংরেজি হবে dogmatism. অর্থাৎ গোঁড়ামি। আমার ঘড়িই ঠিক, তোমার ঘড়ি বেঠিক। আমার মতই মত। আমার পথই পথ। হু আর ইউ। আজকাল একটা চলতি শব্দ এসেছে। মতুয়াদের অভিধানে। সেটি হল ফালতু। তিনি ছাড়া সব ফালতু।

শিক্ষায়, নানারকম ট্রেনিং-এ মনে একটা উদার উদার ভাব আসতে পারে। সে ভাব আবার চলেও যেতে পারে। অভিনয়ের চরিত্র আর আসল চরিত্র এক নয়। কতদিন আমি সাজাহানকে বাজার করতে দেখেছি। যে বেগুনটাতেই হাত দি, বলেন, ও বেগুনটা আমি চোখ দিয়ে বেছে রেখেছি। অনেক দেখে-শুনে একটা ফুলকপি তোলামাত্রই তিনি বললেন, ওটা আমি দেখে রেখেছি। সন্ধেবেলা রঙমহলে এই মানুষটিই সাজাহান সাজবেন। তাজমহল তৈরি করবেন। অভিনয় দেখে দর্শকরা ফটাফট হাততালি দেবেন।

এখন জিনের কথা শুনে ফেলেছি। উদারতা মনে হয় জেনেটিক। মানুষ সঙ্গে করে নিয়ে আসে। এতখানি একটা মন। 'আমার, আমার' বলে সব কিছু আঁকড়ে ধরতে চায় না। তার ভেতরে অনেকটা 'স্পেস' থাকে পরিসর। তার ভাবখানা, 'বসুধৈব কুটুম্বকম'। সবাই তার আপন। কী নেবে? নিয়ে যাও না।

একটা সুন্দর গল্প আছে। একজন আর একজনের কাছে এসে বললে, 'ভাই! তোমার মইটা কিছুক্ষণের জন্যে দেবে একবার।' সে বললে, 'বাবা মইটা সিন্দুকে রেখে গেছে। চাবি তার কাছে।' লোকটি এই কথা শুনে চলে গেল। কিছুদিন পরে এই লোকটি ওই লোকটির কাছে গিয়ে বললে, 'ভাই! তোমার জালটা একবার দেবে, বাড়িতে কুটুম এসেছে। পুকুর থেকে মাছ ধরব।' ওই লোকটি বললে, 'ভাই! জাল কী করে দোব! জালে যে বাবা সরষে বেঁধে রেখে গেছে।'

একবার ভোরের ট্রেনে কোথায় যেন যাচ্ছি। সামনের আসনে এক ভদ্রলোক বেশ ফলাও করে খুলে খবরের কাগজ পড়ছেন। পেছন দিকটা আমার চোখের সামনে। আমি উঁকি-ঝুঁকি মেরে পড়ার চেষ্টা করছি। ভদ্রলোক কাগজের ওপর দিয়ে আমাকে এক নজর একটু দেখে নিলেন। পরক্ষণেই খড়মড় করে কাগজটা মুড়ে নিজের পাছার তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে জানলার বাইরে ছুটে চলা প্রকৃতি দেখতে লাগলেন। আমার বেশ মজা লাগল।

এই কাগজ কেস আরও আছে। আমার এক বড়লোক বাল্যবন্ধুর বাড়িতে সেকালের প্রায় সব কাগজই আসত। আমাদের বাড়ির পরের পরের বাড়িটাই ছিল তাদের। আমার বন্ধুকে বলে, বেলা দুটো নাগাদ একটা কাগজ বাড়িতে নিয়ে আসতুম। তারপর ঝট করে পড়ে, তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ ফেরত দিয়ে আসতুম।

একদিন তার বাবার সামনে পড়ে গেলুম। তিনি খুব ভারিক্কি চালে বললেন, 'এই যে শোনো, অত কাগজ পড়া কী? কাগজ পড়লে চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। পড়ার বই পড়ো, পড়ার বই।'

একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা শেডের তলায়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। কিছুটা দূরেই আমাদের বাড়ি। দেখতে পাচ্ছি, যেতে পারছি না। এমন সময় এক ভদ্রলোক বিরাট একটা ছাতা মাথায় দিয়ে আসছেন। আমি যেদিকে যাব সেই দিকেই যাচ্ছেন। আমি ছুটে গিয়ে তাঁর ছাতার তলায় মাথাটা গুঁজে দিলুম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভটাস করে ছাতাটা বন্ধ করে দিলেন। কোনো কথা নয়। অ্যাকশান। দুজনেই ভিজে যাব। দু'কদম দূরেই আমার বাড়ি। তিনি কতদূর যাবেন কে জানে? ভিজবেন তবু আর একজনকে আশ্রয় দেবেন না।

এইরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে। আমাদের পাড়ায় আরো অনেক বড়লোক ছিলেন। যে যুগে রেডিও খুব কম বাড়িতেই থাকত। এই রকম এক বড়লোকের বাড়িতে বিশাল একটি রেডিও সেট ছিল। তখন রোজ রাতে যে-কোনো এক বড় শিল্পীর খেয়াল গান পরিবেশিত হত, যেমন বড়ে গোলাম আলি, এটি কানন, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় লাহিড়ী, আরো অনেকে। তাঁদের সেই বিশাল রেডিও কাম রেডিওগ্রামটি বাইরের দিকের একটি ঘরে ছিল। গমগমে আওয়াজ।

রাত প্রায় সাড়ে এগারটা। গ্রীষ্মের রাত। ভারি সুন্দর। পশ্চিম থেকে আসছে ফুর ফুরে গঙ্গার বাতাস। বড়ে গোলাম আলি গাইছেন দরবারী। ঘরের লাগোয়া রাস্তার দিকের উঁচু রকে বসে মোহিত হয়ে গান শুনছি, আমি আর আমার সঙ্গীত রসিক এক বন্ধু। ঘরে মৃদু একটি আলো জ্বলছে। ঘরে কেউ একজন আছেন। আধখোলা জানালা দিয়ে ফুরফুর করে বেরিয়ে আসছে গোলাপী রঙের ধোঁয়া। ম্যাক্রোপোল সিগারেটের সুন্দর কোকো-গন্ধ।

এতকাল আমরা নীরবে, নিঃশব্দে গান শুনতুম। সেদিন আলিসাহেবের একটা কাজ শুনে আমরা—আহা! আহা! করে উঠেছি। জোরে নয়। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর দিক থেকে একটা হাত এগিয়ে এল জানলার পাল্লার দিকে। খটাস্ করে শব্দ। বন্ধ হল জানলা। তবু শুনতে পাচ্ছ। পরক্ষণেই রেডিও বন্ধ। মধ্যরাতের জনশূন্য পথ। দূরে কোথাও একপাল কুকুর তারস্বরে চিৎকার করছে।

বাসের পাদানিতে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আর একজন ধাবন্ত বাসে লাফিয়ে উঠেছেন। একটি পা কোনোরকমে পাদানির একটি সামান্য অংশে স্থান পেয়েছে। শরীর আর আর একটি পা বাসের গতির সঙ্গে পতাকার মতো উড়ছে। দণ্ডায়মান ব্যক্তিটি কিছুতেই তাঁকে আর একটি পা রেখে নিরাপদ হওয়ার সুযোগ দেবেন না। সেই মুহূর্তে তিনি ওই পাদপীঠের অধীশ্বর। কৌরবপক্ষীয় দুর্যোধন। বিনা রণে না দিব সূচ্যগ্র মেদিনী। কঠোর মুখ। উদাস দৃষ্টি। পৃথিবীর বাইরের কোন মহারাজ। কলকাতার স্টেটবাস পরিদর্শনে এসেছেন। এই গানটি এমন মানুষকে উপহার দেওয়া যেতে পারে—বোম্বাইসে আয়া মেরা দোস্ত। দোস্ত কো সেলাম করো।

আমার চোখের সামনে অতি সুখের, অতি সম্পন্ন একটি যৌথ পরিবার ভেঙে টুকরো হয়ে গেল। শেষ যুদ্ধ—'তারের লড়াই'। লড়াইটা আমার চোখের সামনে

প্রায়ই ঘটত। বিশাল বাড়ির বিশাল ছাত। পারিবারিক শান্তি-রক্ষার জন্যে চারপাশে চারটি তার। একটিতে রোদে ঝুলবে বড়র পরিবারের জামা-কাপড়। অন্যটিতে মেজর। আর একটিতে সেজর। মেজর তার পূর্বদিকে। সেজর পশ্চিমে। সেজর তারে অনেকক্ষণ রোদ থাকে। সূর্যের উদয়, অস্তের মতো,মেজর জামা-কাপড় সেজর তারে চলে আসে। সেজর তার খালি থাকলেও, তিনি এসে টান মেরে সব ফেলে দেবেন ছাতের ধুলোয়। নো, আই নট অ্যালাউ-উ-উ। তারে ইনফেকশান হয়ে যাবে। শরীরে কার কী ইনফেকশান আছে, কে বলতে পারে! ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে গা চুলকোয়!

ইনফেকশান? তোর বাপের ইনফেকশান। তোর চোদ্দো গুষ্টির ইনফেকশান। নীরদ সি চৌধুরী ঠিকই লিখেছিলেন, ঝগড়ার সময় শিক্ষিত বাঙালিরাও শালীনতা ভুলে অশিক্ষিত বর্বর হয়ে যায়। ইনফেকশান ক্রমশই ঠেলে ওপর দিকে উঠতে লাগল। শেষে পাকড়াও করল সেজর প্রপিতামহকে। তাঁর না কি রক্ষিতা ছিল। বাংলায় তখন জমিদারি আমল। রক্ষিতা মানেই সিফিলিস। সেই কারণেই সেজর বংশের অনেকে ট্যারা। সেজ নিজেও না কি লক্ষ্মীট্যারা। অনেকক্ষণ তাকালেই বোঝা যায়।

তারের যুদ্ধ ছাত থেকে নিচে নেমে সোজা আদালতে। তিনটে পাঁচিল উঠল। ওই যৌথ ছাতেই ভাগা-ভাগা ফুল গাছের টব। এ জল পায় তো, ও জল পায় না। কারণ টবের মালিক প্রতিপক্ষ।

এর পরে আরও মজা আছে। ভিখিরি এসে চেল্লাচ্ছে। পাড়ার লোক অতিষ্ঠ। কিছু দিয়ে দিলেই শান্তি হয়। ব্যাপারটা কী? ও বড়র তরফের। মেজরও নয়, সেজরও নয়। বড়রা সপরিবারে তীর্থে। কে বললে, যা হয় দিয়ে শান্তি করো না। না, আইন ইজ আইন। যার ভিখিরি তার ভিখিরি। কুলপুরোহিতকে তিন খণ্ড করা যাবে না। সমস্যাটা রয়েই গেছে।

উদারতার আর একটি অভিজ্ঞতা, দুই ভাই লড়ালড়ি করে হাঁড়ি আলাদা হয়েছে—গুমোট শান্তি বিরাজ করছে। পাড়ায় একটাই গমকল। দু'পরিবারেরই গম যায় সেখানে আটা হতে। ব্যাগগুলো আজকাল প্রায় একই রকম দেখতে। গম ভর্তি ব্যাগ রেখে আসা হয়, পরে আটা ভর্তি ব্যাগ ফিরে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে আসে না, দু-একদিন পরে আসে।

ছোটভাই ব্যাগ নিয়ে ঢোকামাত্রই বউ তেড়ে উঠল, 'এ কি! এত গণেশ! আমাদের শিব। এটা ওদের।'

ব্যাগের গায়ে গণেশ আঁকা। গণেশ বড় ভাইয়ের। শিব ছোট ভাইয়ের। পাশেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। একুশটা ধাপ ভাঙলেই বড় ভাইয়ের এলাকা। ব্যাগটা দিয়ে এলেই হত। তা হবে না। সাত কেজি ওজনের ব্যাগটা সাতমিনিট হেঁটে দোকানে ফিরে গেল। ব্র্যাভো! চালিয়ে যাও লড়াই।

একটা গল্প আছে, ভগবান এসেছেন। খুশি হয়ে। বলছেন, বর চাও, তবে একটা কথা, তুমি যা পাবে, তার ডবল পাবে তোমার প্রতিবেশী।

লোকটি বললে, প্রভু! আমার একটা চোখ কানা করে দিন।

ভগবান অবাক! সে আবার কী?

আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু। তাহলে আমার প্রতিবেশীর দুটো চোখ কানা হয়ে যাবে। মানুষ যখন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, লক্ষ করলে দেখা যাবে, শিশুটির হাত মুষ্টিবদ্ধ থাকে। প্রবেশ, অর্থাৎ জগতে প্রবেশ করছে হাত মুঠো করে। যেন এই ধারণা নিয়ে আসছে—এ জগত আমার, এক মাত্র আমারই। আবার এই জগত ছেড়ে যখন চিরবিদায় নিচ্ছে তখন হাত আর মুষ্টিবদ্ধ থাকে না, খোলা। মৃতদেহ যেন বলতে চাইছে, দেখ হে, সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে যাওয়া গেল না।

ইন্দিরা গান্ধী একবার একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন, মুঠো হাতে করমর্দন করা যায় না।

একালের মনোবিদগণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে অনেক ধরনের মধ্যে একটি ধরনের উল্লেখ করে বলেছেন—'ক্লোজড টাইপ।' দরজা জানলা বন্ধ গুমোট ঘরের মতো। কিছু নিতেও পারে না। কিছু দিতেও পারে না। গটগট করে পৃথিবীতে এল, থপ থপ করে, ঠুক ঠুক করে, ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিকে তাকাতে, তাকাতে বেরিয়ে গেল। তিনটে কৃত্য ফেলে রেখে—আহার, নিদ্রা, মৈথুন।

দুজন গল্প করতে করতে চলেছে। এক অন্ধ এসে ভিক্ষে চাইলে। একজন সঙ্গে সঙ্গে কিছু পয়সা তাকে দান করল। আর একজন ধমকে উঠল, ওই তো দিয়েছে। একজন দিলেই হবে।

অন্ধ ভিক্ষুক ঠুক ঠুক করে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই যমদূত এসে হাজির। যে ভিক্ষুকটিকে পয়সা দিয়েছিল তাকে বললে, 'আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না, তোমার এই উদারতার জন্যে আরো পঞ্চাশবছর বাঁচবে। আর তুমি?'

যে কিছুই দেয়নি, তাকে যমদূত বললে, 'তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

লোকটি বললে, 'আমি ছুটে গিয়ে কিছু দিয়ে আসি না!'

যমদূত মুচকি হেসে বললে, 'তাতে কিছু হবে না বাছা! সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার আগে দেখে নিতে হয়, নৌকোয় ফুটো-ফাটা কিছু আছে কি না!

একবার ভেসে পড়লে আর মেরামত করা যায় না।'

গল্প নয়, বাস্তব একটি ঘটনা। শুক্রবার, নমাজের বার। নিষ্ঠাবান এক মুসলমান ভদ্রলোক অপরাহ্নবেলায় মসজিদে চলেছেন। নমাজ করবেন। যেতে যেতে দেখলেন, পথের একধারে দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি অবহেলায় পড়ে আছেন। দুপাশ দিয়ে উদাসীন শহরের জীবন-স্রোত হুহু করে বয়ে চলেছে। আহত, সংজ্ঞাহারা মানুষটির দিকে কারো নজর নেই। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু লোকের দৃষ্টি পড়ল। তাঁরাও দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসলমান ভদ্রলোকটি প্রথমে ভাবছিলেন, আহত মানুষটির জন্যে কী করা যায়। এইবার যেই কিছু মানুষের জমায়েত হল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তা ঘুরে গেল। নমাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে। আরো অনেকে এসে গেছে।

এখন যা করার তারাই তো করবে।

ভদ্রলোক মসজিদে এসে প্রার্থনা শুরু করলেন। বহু চেষ্টা করেও মন বসাতে পারলেন না। একটা অপরাধ বোধ। আহত মানুষটি পথের ধারে পড়ে রইল। আর আমি এখানে প্রার্থনায় বসেছি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্যে। বিপন্ন মানুষের প্রতি যে উদাসীন ঈশ্বর কি তার প্রার্থনা শোনেন? ঈশ্বর কি এমন মানুষের সেবা গ্রহণ করবেন!

ইসলামের ভূমি থেকেই সুফী ধর্মের উদ্ভব। সুফীরা বলেন, মানুষের সেবাই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেবাই হল শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। আজমীরের শ্রেষ্ঠ সাধক, শেখ মৈনুদ্দিন চিস্তি একটি সুন্দর উপদেশ রেখে গেছেন, 'নদীর মতো উদার হওয়ার চেষ্টা করো, সূর্য-কিরণের মতো বিশ্বজোড়া উদ্ভাস আনার চেষ্টা করো চরিত্রে, আর পৃথিবীর মতো আতিথেয়তা অভ্যাস করো।'

ধর্ম হঠাৎ এমন অনুদার হয়ে গেল কী করে? কেন এত হানাহানি?

রাজনীতিই বা কেন এত রক্তাক্ত? রাম আর রহিমের সম্পর্ক কাদের কৃপায় এমন বিষাক্ত হল?

এত উদার চারপাশে! উদার অর্থনীতি, উদার সমাজনীতি, উদার ধর্মনীতি, উদার মতবাদ। সবই উদার। উদার গণহত্যা। গণহত্যার এই উদারতার দাতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। হিটলার সায়েবের বৈজ্ঞানিক ইহুদী-নিধন। জাপানের কামিকাজের ঘরোয়া রূপ একালের মানববোমা। মানুষ মারাটাকে কত বৈজ্ঞানিক করা যায়! সাধনার শেষ নেই। ফরাসিদের লেজার গাইডেড মিসাইল একালের যুদ্ধের ধরন পালটেছে। কত রকমের উদ্ভাবন, বাঙ্ক ব্লাস্টার, ক্লাস্টার বম্ব। পাইলট লেস ফ্যান্টম বিমান। স্টার ওয়ার। আমেরিকান সেন্টারে সন্ত্রাসবাদীরা যে অস্ত্র থেকে গুলি চালিয়েছিল, তার স্পিড হল ৫.৪ সেকেন্ডে ৫৪ রাউন্ড গুলি। কলকাতায় এমন অস্ত্র আগে কখনও ব্যবহার হয়নি। উদারপথে এমন অস্ত্র দেশে ঢুকছে। রিভলভার পকেটে পকেটে। ইভটিজিংকে আরো উদার করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

উদার ড্রাইভিং-এর গুণে কে কখন উদার আকাশে পৌঁছে গিয়ে মুক্তির আনন্দে খিল খিল করে হাসবে কেউ জানে না। উদার ফ্যাশানের কৃপায় শয়নকক্ষের সাজ পথে নেমেছে। আটপৌরে সেকেলে লোকের মহাসমস্যা—মা, তোমার কোন দিকে তাকাব! সর্বত্রই যখন এত উদারতা, তোমার পোশাক কেন তোমার প্রতি এত অনুদার?

গাড়ি চালানো যেমন শিখতে হয়, উদারতাও সেই রকম অনুশীলন করতে হয়। পারিবারিক জীবনশালায় সেই শিক্ষার গুরু। শিক্ষায় সংস্কার কিছুটা জন্মায়। শৈশব থেকেই মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হয়, সমাজ বলে একটা ক্ষেত্র আছে, সেই ক্ষেত্রে ষাঁড়ের মতো গুঁতিয়ে বিচরণ করলে তোমাকে লোকে মানুষ বলবে না। চলিত বাঙলায় একটা কথা আছে—একলষেঁড়ে।

সেদিন কোনো কাজে নামী একটি স্কুলে গেছি। প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মা তাঁর শিশুটিকে

ভীষণ বকছেন--তুই কেন দেখালি? তোর খাতা কেন তুই ওকে দেখালি?

নিষ্পাপ শিশুটির চোখে-মুখে বিস্ময়—দেখালে কী হয়?

হেরে যায়। মানুষ হেরে যায়।

খেলার জগতে একটা কথা আছে—'কিলার ইনস্টিংক্ট্'। প্রতিদ্বন্দ্বীকে মেরে ফেলব, খেয়ে ফেলব, কেটে ফেলব। টেনিস র‍্যাকেট থেকে বল আসছে একশ চল্লিশে। প্রতিপক্ষ তুলতে চাইছে একশ পঞ্চাশে। টাইসন চাইছেন এক ঘুসিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর চোয়াল ঝুলিয়ে দিতে।

মেজর জেনারেল যুদ্ধক্ষেত্রে দয়া দেখাবার জন্যে উদার হলে যুদ্ধে হারবেন। বুলেট চালানোয় উদার হতে হবে। পুলিসকে হতে হবে ডাণ্ডায় উদার। রাজা কী হবেন? লেখা আছে—প্রজা দরদী। তা হয় না। 'রুলারস আর অলওয়েজ রুলারস হোয়াট এভার মে বি দি সিস্টেম।' পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, নিজের পুঁজি বাড়াতে অসুবিধে কোথায়? আশিভাগ মানুষ দুবেলা খেতে পায় না বলে আমি ছাতুর তাল খেয়ে আম্ত্রিকে মরব না কি?

মানুষ বড়লোকের বড়লোকী চাল দেখতে ভালবাসে। পরাধীনতা মজ্জায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। ইংরেজের ফেলে যাওয়া ছেঁড়া পোশাক, টয়লেট পেপার পড়ে আছে এখনো। সায়েব হতে ভালবাসি। সে হওয়াটা কেমন, নিষ্ঠুর, ক্ষমতালোভী, ভোগবাদী, স্বার্থপর, হাই ব্রাউ। যারা হতে পারে না, তারা সমীহ করে। নেটিভ স্টেটের রাজারা এখনো নির্বাচনে দাঁড়ালে বিপুল ভোটে জেতেন। হতদরিদ্র দেশের মুখ্যমন্ত্রী মেয়ের বিয়েতে কোটি টাকা খরচ করেন। শীর্ণ মানুষ, ছিন্ন বসনে জলুস দেখেন। গাছতলায় বসে বিড়ি আর চুটিয়া সহযোগে এক মাস ধরে গল্প করেন। একজন উদার হলে আর একজনের কী লাভ? হুতোম যেমন বলেছিলেন সেইরকম না কি? একটি বড়লোকের ছেলে মাতাল হলে, মদ ধরলে আর পাঁচটি মাতাল প্রতিপালিত হয়। বাবুর উদারতায় সন্ধেটি বেশ ভাল কাটে।

সঙ্গে সাবু, মিছরি, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। বিদ্যাসাগর মশাই ঘুরছেন। কে অসুস্থ, ওষুধ জোটেনি, কার জোটেনি পথ্য! অর্থাভাবে কার লেখাপড়া বন্ধ! আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত তাঁর উদারতা—বাল্যবিধবাদের ওপর হিন্দুধর্মের কেন এই অত্যাচার!

রাজা রামমোহন দেখছেন, জ্যান্ত স্ত্রীটিকে স্বামীর চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছে জোর করে। তুমি পুড়ে ছাই হয়ে সতীর পুণ্য অর্জন করো। বাজাও ঢোল, খোলে তোল বোল। নৃত্য করো হিন্দুধর্মের প্রভুরা।

শ্রীরামকৃষ্ণ লোকান্তরিত। তাঁর সাক্ষাৎ পার্ষদদের অনেকেই পরিব্রাজক হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরছেন। শুধু ধর্মের অবস্থা নয় জনজীবনের অবস্থাও দেখছেন। পরাধীন ভারতের আমজনতার অবস্থা।

স্বামী অখণ্ডানন্দ জামনগরে এক ধর্মপ্রাণ শেঠজির বাড়িতে অতিথি হয়েছেন। শেঠজি উদার। তাঁর পরিবারবর্গ ভয়ঙ্কর। সন্ন্যাসীর প্রভাবে শেঠজি আরো অন্যরকম হয়ে যাচ্ছেন। সন্ন্যাসীর কথায় ওঠেন, বসেন। একটা মন্দির করবেন। প্রচুর টাকা

সেবায় নষ্ট হচ্ছে।

তখন অন্তরালে পরিকল্পনা হল, সন্ন্যাসীকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলো। কফির সঙ্গে জয়পালের বীজ। অখণ্ডানন্দজী দেখছেন, কফির ওপর তেলের মতো কী ভাসছে। চুমুক দিয়ে দেখলেন—স্বাদ ঝাল ঝাল। ভাবলেন, বাটনার হাত লেগেছে, ঘিয়ের স্পর্শ। খাওয়ার ঘণ্টাখানেক পর থেকেই শুরু হল প্রচণ্ড দাস্ত। চারদিন উত্থানশক্তি রহিত।

সন্ন্যাসী ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন না। জানতেন, তাঁকে যিনি উদ্ধার করলেন, সেই ঝণ্ডুভট বিঠ্ঠলজী। তিনি ছিলেন আয়ুর্বেদাচার্য। বিশাল মনের অধিকারী দেবতার মতো এক মানুষ। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গেও তাঁর মিলন হয়েছিল জুনাগড়ে।

স্বামীজী বলেছিলেন, 'অনেক দাতা দেখেছি, কিন্তু ঝণ্ডুভট বিঠ্ঠলজীর মত দয়ালু পুরুষ কোথাও দেখিনি।' শেঠজীর বাড়িতে অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে ভটজীর যখন আলাপ হচ্ছে, তখন বাঙলায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনদীপ নিবছে। ভটজী বললেন, তাঁর একটা জীবনী আনান। অখণ্ডানন্দজী আনালেন বিদ্যাসাগর জীবনী। রোজ সেই জীবনী পাঠ হত। ভটজী শুনতেন আর কাঁদতেন।

ভটজীর কথা কেন? সত্তর বছরের বৃদ্ধ ভটজী রন্তিদেব-কথিত একটি শ্লোক রোজ আবৃত্তি করতেন। তখন তাঁর দুচোখ বেয়ে জল গড়াত। শ্লোকটি হল,

কো নুন ন স্যাদুপায়োছত্র যেনাহং সর্বদেহিনাম্।
অন্তঃ প্রবিশ্য সততং ভবেয়ং দুঃখভারভাক্।।

মানে হল, এই সংসারে এমন কি উপায় আছে, যে উপায়ে আমি সকল দুঃখী প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে তাদের দুঃখ নিজেই ভোগ করতে পারি? সেই থেকে এই শ্লোকটি হয়েছিল স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জীবন-মন্ত্র। ভটজীর মুখে শোনা আর একটি শ্লোকও তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। শ্লোকটির ভাবার্থ—এমন স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ চাই না যেখানে মানুষের সেবা করার কোনো সুযোগ নেই। স্বামী বিবেকানন্দ এটি শুনে অশ্রু সম্বরণ করতে পারেননি। আমেরিকায় ধনীর গৃহে বিশাল পালঙ্ক, উত্তম শয্যায় শয়ন করতে পারছেন না। কার্পেটেই বিশ্রাম—ভারত, ভারতের মানুষ, ছিঁড়ে খাওয়া দারিদ্রের কথা মনে পড়ছে। 'যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম না পৈশাচ নৃত্য!'

স্বামীজী ভারতের অসহায়, দরিদ্র, অনুন্নত মানুষদের জন্যে নিজেকে জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। এই নাও আমার অস্থি, আমার ছাই। সব শাস্ত্র আর পুরাণাদি ঘেঁটে এইটি আমি পেয়েছি, সর্বশাস্ত্র পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্। পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পর পীড়নম্।। পরোপকারে পুণ্য, পরপীড়নে পাপ।

স্বামীজী আমাদের রোগটা ধরেছিলেন, 'জেলাসি', হিংসুটেপনা। বলছেন, 'আমাদের

মতো দুনিয়ায় কেউ নেই, আর্যবংশ!!! কোথায় বংশ তা জানি না... একলাখ লোকের দাবানিতে ৩০০ মিলিয়ান কুকুরের মত ঘোরে, আর তারা 'আর্য বংশ'!!!

জনে, জনে, মনে মনে উদারতার একটি বিন্দুও যদি থাকত! কোথাও আছে, বেশির ভাগই নেই। কোনও কালেই কি ছিল? চিরকালের একই কথা—

গিভ অ্যান্ড টেক। ফেল কড়ি মাখ তেল। হিজ হিজ, হুজ হুজ।

মৈমনসিংহ জেলার একটি প্রাচীন লোককাহিনী—এক ব্রাহ্মণ ভগবানের খোঁজে বেরিয়েছেন। সেই ভগবানের নাম —হরিসঙ্কট। পথের ধারে একটি সুপারি গাছ মানুষের ভাষায় কথা কয়ে উঠল—ব্রাহ্মণ! ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস কোরো তো, মাথায় পাতার বোঝা, ফলের ভার। একটা পাতা, কি ফল কখনো ঝরে পড়ে না। এই ওজন মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি এক ঠ্যাঙে বছরের পর বছর। কবে এই পাপের বোঝা মাথা থেকে নামবে!

এর পরেই দেখা হল এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে। তার পেছনে একটা পিঁড়ে আটকে আছে। স্ত্রীলোক বললে, ও ঠাকুর! তোমার ঠাকুরকে জিজ্ঞেস কোরো তো, কোন পাপে আমার এই দশা!

আর এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা। ব্রাহ্মণী বললে, ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করো তো. কোন পাপে আমার এই ঠোঁটের চুন কিছুতেই কেন উঠছে না?

ব্রাহ্মণ হাঁটছেন, তো হাঁটছেন। এইবার একটি লোকের সঙ্গে দেখা। তার মাথায় বিশাল একটি বোঝা। লোকটি বললে, ভগবানের খোঁজে বেরিয়েছ? তা বেশ দেখা হলে একটি কথা জিজ্ঞেস করো—কোন পাপে আমার মাথার এই বোঝা নামানো যায় না!

পথিক চলেছে ঈশ্বরের খোঁজে। ক্লান্ত, শ্রান্ত। আর পারে না। একটি নদী। বসে পড়ল সেই নদীর ধারে। এমন সময় অতি বৃদ্ধ একটি লোক লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুক ঠুক করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? এখানে এই ভাবে পড়ে আছ কেন?

ব্রাহ্মণ তার সাংসারিক দুঃখ-কষ্টের কথা সবিস্তারে জানাল। ভগবানের দর্শনে ঘুরে ঘুরে আমার এই দশা। তাঁকে প্রশ্ন করব যদি দেখা পাই, কেন আমাকে এই শস্তি দিলেন—সব দিয়ে সব কেড়ে নিলেন!

বৃদ্ধ বললেন, ওঠো! উঠে দাঁড়াও। যার খোঁজ করছ, আমিই সেই। অনেক কথার পর ব্রাহ্মণ সুপুরি গাছের প্রশ্নটি নিবেদন করল।

বৃদ্ধ ভগবান বললেন, এই গাছ পূর্বজন্মে মানুষ ছিল। একটি মেয়ে পুজোর জন্যে একটি সুপুরি চেয়েছিল। সুপুরি থাকা সত্ত্বেও সে দেয়নি। তাই আজ তার এই অবস্থা!

আর ওই, যার মাথার বোঝা নামানো যায় না, পূর্বজন্মে একজন তাকে বলেছিল. ভাই! একটু হাত লাগাও তো। মাথা থেকে ঝাঁকাটা নামাই। সে শুনেছিল, কিন্তু সাহায্যের হাত বাড়ায়নি।

যার পেছনে পিঁড়ে, পূর্বজন্মে সে ছিল বড়লোকের বাড়ির অহঙ্কারী বউ। বাড়িতে

কেউ এলে তাকে বসতে বলত না। সেই অহঙ্কারের ফল ভোগ করছে এই জন্মে।

যার ঠোঁটে অক্ষয় চুনের ফোঁটা, সে আগের জন্মে কী করত! পরনিন্দা, বাদ-বিবাদ। এই জন্মে তাঁর ঠোঁটে মার্কা মেরে দিয়েছি।

প্রাচীন এই রূপকে একটিই ইঙ্গিত—মানুষ মানুষের কাছ থেকে উদারতা চায়। দশটা টাকা দেওয়া যেতে পারে মনের দরজার তালা খোলা সহজ নয়। দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।

গাড়ির চালককে ডিশে সাজিয়ে মিষ্টি দিতে যাচ্ছে, মালিক শিউরে উঠলেন, না, না, না, না, ড্রাইভারকে অত খাতির কীসের! এর নাম ক্লাসলেস সোসাইটি! যার হাতে স্টিয়ারিং, মরণ-বাঁচন, সে লোকটা মানুষ নয় ড্রাইভার। মুটে, মজুর, চামার, চণ্ডাল—বিভাজন সব 'মোর মনে'। বড়লোক! কিন্তু মনটা ছোট। অর্থে বড় লোক, মনে ছোট লোক।

একটু সরে বসলে আর একজন বসতে পারে। সরব না।

একটু উদার হলে পরিবারে শান্তি আসে। হব না।

হাত বাড়ালেই আর একটা হাত এগিয়ে আসে। বাড়াব না।

আধুনিক জীবন এক 'প্রিকেরিয়াস জার্নি'। প্রচণ্ড গতিশীল এক যানের পাদানিতে ঝুলে আছি।

ছোট একটি টেবিল। ডোমে ঢাকা একটি টেব্‌ল ল্যাম্প। ছোট একটি আলোর বৃত্ত। তার বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আমার আলো আমার আলো। তোমার আলো তোমার আলো।

অন্ধকার রাত। পাঁচশো বছর আগের রাত। একটি মিছিল আসছে। প্রত্যেকের হাতে মশাল, কণ্ঠে হরিনাম। শত শত খোলে বাজছে মহাবোল। মিছিল পরিচালনা করছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। অনুদার কাজিকে ধর্মের উদারতা শিক্ষা দেবেন। কাজি শাসনের কুর্সি ছেড়ে নেমে এলেন প্রেমের সুরধুনীতে। ইতিহাস।

মশাল আজও আছে। মহাপ্রভু নেই। গুজরাত জ্বলছে। যিস দেশমে গঙ্গা বহতি হ্যায়। সেই দেশেই সমান্তরাল বইছে রক্তের নদী। তার অনেক শাখা-প্রশাখা। মৃত শিশুটিকে কোলে নিয়ে নির্যাতিতা মাতার ভারতচিত্র। আলোর বদলে আগুন। জলের বদলে রক্ত। পোড়া মাটির বাইরে।

'উদারতা' বিষয়টি বিষয়ের মতোই বিশাল। একটা বই লেখা যায়। এতটা উদারতা সম্পাদক মহাশয় সহ্য করবেন না। শেষ কথাটি 'অ্যানা ফ্রাঙ্ক'-এর। ইতিহাস এই ফুলটিকে সাজিয়ে রাখবে চিরকাল, মৃত্যুর পদতলে শাশ্বত জীবন-পদ্ম। ডায়েরির একটি পাতায় এই আশ্বাস—Inspite of every thing I still believe that people are really good at heart.

এইবার যাই কোথায়

মেজাজ কেন এমন হচ্ছে! রক্তে সব সময় যেন 'গোরা ব্যান্ড' বাজছে। সব অদৃশ্য কেউ একজন অর্ডার দিচ্ছে—'ফায়ার!' বাইরের ঘরে বসে এক গেলাস জল চাইলুম, 'এক গেলাস জল দাও।' পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল। অন্দরমহলে কেউ শোনেনি। এরপর বোধহয় 'রিলে' হল। কাজের মহিলা আমার চটির ওপর দিয়ে দ্রুত ঘর মুছছিল। দশ বাড়ি কাজ। অত সময় নেই। স্রেফ টেনে দাও। সেলুনে দাড়ি কামাবার মতো। ডানদিকে জুলপির কাছে ক্ষুর বসাও 'কাপ' করে, মারো হড়কা টান। হাফ-রাউন্ড দাড়ির কাছে স্টপ। বাঁ দিকে একই অ্যাকশ্যান। এরপর চিবুকের তলায় দুটো আঙুলের আর্টিস্টিক উর্ধ্ব ঠেলা, গলনালী উন্মুক্ত। ক্ষুর-স্থাপন, ঝটিতি উলটো টান। কান কাটার মতো ঠোঁটের দুপাশে দুটো জবাই টান। গোঁফ সাফ। ফুসকুড়ি-মুস্কুড়ি দু-একটা যা ছিল এই 'কুইক-অ্যাকশানে' উপড়ে গেল। রক্তাক্ত গালে এবড়ো-খেবড়ো ফটকিরি ঘর্ষণ। জ্বলতে জ্বলতে গৃহে প্রত্যাবর্তন। 'ইনডিজেনাস মেথড অফ রিয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট।' ঘর-মোছার পদ্ধতিও এক রকম। যা পড়ে আছে তার ওপর দিয়ে পাটে ন্যাতা মেরে দাও। সদ্যোজাত শিশুটিকে মা মেঝেতে শুইয়ে রেখেছিলেন রোদে, তার ওপর দিয়ে ন্যাতা চলে গেল। যাই হোক, সে গিয়ে বললে, কাকাবাবু

কী বলছে গো! সে-ও পুরোটা শোনেনি। শোনার সময় নেই। কেউই আজকাল পুরোটা শোনে না। সবাই শোনাতে চায়।

রন্ধনশালা থেকে ভয়ঙ্করী মূর্তিতে গৃহিণী প্রকাশিত হলেন, 'কী বলছ কী? এই তাড়াহুড়োর সময়?'

'কিচ্ছু বলিনি।'

'বলোনি তো বলোনি।' সবেগে পাকশালায় প্রস্থান। ঝনঝন শব্দে বাসনের পতন। ক্ষিপ্ত বচন। পদাঘাত। নিরীহ একটি গেলাস, পেনাল্টি এরিয়া থেকে গোলে ঢুকে গেল। গোলকিপার পুসি বাসরের ঘরে পালিয়ে এল। মারাদোনার 'কিক' আটকাবার মুরদ তার নেই।

ঘরের কোণে একটা আধপোড়া মালসা ছিল। মশা মারা ম্যাট নীল থেকে সাদা হয়ে গেলে ছোবড়া জ্বেলে সেই নিবু নিবু আগুনে ফেলা হয়। মশা মরে কি না জানি না, মানুষ কাশতে কাশতে পালায়।

এত রাগ, সেই মালসা হাতে রাস্তার কলে। পাশেই পান-বিড়ির দোকান। এক সপ্তা আগেও কাকাবাবু বলত, আজ বলছে দাদু—'কী করছেন দাদু?'

'দাদু' বলায় রাগের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। কোনও উত্তর দিলুম না। তখন আমি রাগের গোলা। জল ভরে চুমুক দিতে যাচ্ছি। লাফিয়ে এসে সে বাধা দিলে, 'কচ্ছেন কী! মরে যাবেন যে। কাঁপছেন কেন?'

'দাদু' বললেও ছেলেটি দরদী। পাশেই চায়ের দোকান। এক কাপ চা খাওয়ালে। রাগে ভাঁটা পড়ছে। অস্তিত্বের চড়া জাগছে। ধীরে ধীরে বাড়ি ঢুকছি। হাতে পোড়া মালসা, যেন শ্মশানে রাত জেগে মহেশ্বর ফিরছেন। কানে এল, গৃহিণী বলছে, 'যদ্দিন বাঁচবে তদ্দিন জ্বালাবে।'

আবার চড়াক্। 'এইবার যাই কোথায়?'

চড়াক্ মানে রাগ চড়ে গেল। একটা ঘটনার কথা বলি। প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল। প্রেমের মতো ব্রাত্য আর কিছু নেই। সেকালে নিষিদ্ধ মাংস খেলে, খ্রিশ্চান হলে বা যবনী-সঙ্গ করলে পতিত হত। সমাজচ্যুত হত। একঘরে হত। ধোপা-নাপিত বন্ধ হত। সেইরকম প্রেমিকাকে বিয়ে করলে—মায়ের মুখ তোলো হাঁড়ি। পিতা গম্ভীর। আত্মীয়-স্বজনের ছি ছি—বিধু এটা তুমি কী করলে! প্রেমের বিয়েতে মেয়েদের তেমন সমস্যা নেই ছেলেটি যদি ভাল হয়। বাপ, মা বলবেন, 'রেখার ক্যালি আছে বটে! দেখতে শুনতে এমন আর কি—একটাকে খেলিয়ে তুলেছে তো!'

সেইরকম এক প্রেমের বিয়ে। সবাই পরিত্যাগ করেছে। প্রেমের বিয়েতে ফাটাফাটির সম্ভাবনা বেশি। প্রথমে একটু একটু, ছাড়া ছাড়া। তারপর বেশি বেশি, বাড়া বাড়া। তারপর মুখোমুখি হলেই ফ্যাঁস-ফোঁস। আত্মীয়-স্বজনের কাছেও বলা যাবে না। তারা হ্যা হ্যা করে হাসবে আর বলবে—জেনে শুনে বিষ করেছ পান।

একেই বলে, 'কিল খেয়ে কিল হজম করা।'

সেইরকম একটা কেস। গৃহত্যাগ করে যাওয়ার জায়গা নেই। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সোজা শ্বশুরবাড়িতে। তিন বছর হয়ে গেল। শ্যালিকার আদর যত্নে বেশ ভাল আছে। ইতিমধ্যে শ্বশুর, শাশুড়ি, গৃহত্যাগ করে মেয়ের বাড়িতে এসে উঠেছেন।

শ্বশুরবাড়িটা বাপের বাড়ি হল, আর বাপের বাড়িটা শ্বশুরবাড়ি হল। সে না হয় হল, আমার কী হবে! গৃহত্যাগ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। শ্বশুরবাড়ির পাট চুকে গেছে। দুজনেই ওপরে। আমার রাগের ওপর স্ত্রীর মোলায়েম কথার প্রলেপ পড়লে সব ভুলে যাই। 'কথায় কথায় অত রেগে যাও কেন? তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। থাকার মধ্যে, আমি আর তুমি, তুমি আর আমি।'

তখনই আমার বোধোদয় হয়। এই রাত। নির্জন পল্লী। শ্বাপদসঙ্কুল এই পৃথিবী সুখ-দুঃখের স্যুটকেস হাতে আমরা দুজন রাত্রির যাত্রী। জীবনসাথী যদি আগেই নেমে যায়, বাকিটা পথ আমাকে তো একাই যেতে হবে।

নিজেই নিজের চৌকিদার হয়ে অন্তরের অন্দর মহলে চিৎকার করি--জাগতে রহো।

এই ছিল এই নেই

নীল রঙের বড় বালতিটা বাথরুমে নেই। গেল কোথায়? খানিক অশান্তি।

কেন অশান্তি! এতদিন সংসারে আছেন। কেন জানেন না, অদৃশ্য বালতির রহস্য! সেটি এখন খোলা ছাতে, মুক্ত বাতাসে। ভিজে জামা-কাপড় নিয়ে এই সংসারেরই কোনও সদস্য ছাতে গিয়েছিলেন। তিনি সেটিকে আর ফিরিয়ে এনে যথাস্থানে রাখেননি। কেউ কি রাখেন? বালতি তো আর শিশু নয়, যে সকালে স্কুলে দিয়ে এসে মধ্যাহ্নে ফিরিয়ে আনার খেয়াল রাখতে হবে!

অনেকে বাড়ির বৃদ্ধটিকে হাসপাতালে চালান করে দিয়ে ফিরিয়ে আনতে ভুলে যায়। উন্মাদরা আরোগ্য লাভের পরেও উন্মাদ আশ্রমেই পড়ে থাকে। কেউ ফিরিয়ে আনে না। একমাত্র অবধারিত মৃত্যুই জীবন থেকে জীবকে যথাসময়ে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনে।

অনেক সময় অনেক স্বামী-স্ত্রীকে বাপের বাড়ি রেখে এসে আর ফিরিয়ে আনেন না। যানবাহনে অথবা রেস্তোরাঁয়, যে জিনিসটি পাশে নামিয়ে রাখা হয়, বা পাশের খালি চেয়ারে, সেটি ওইখানেই থেকে যায়। এমন কি ট্যাক্সিতেও এটি ঘটতে পারে। পেছনের আসনে মাথার পেছনের দিকের খাঁজে তুলে রাখলে তো হয়েই গেল। অনেক পরে মনে পড়বে, তখন আক্ষেপসূচক একটি শব্দেই সব সমাধান, সেটি হল,

'বাঃ'। তার পরে এক পশলা স্ত্রীর বাণী নিচয়। বিশেষণের মালা। সে সব আল্হাদিত হওয়ার মতো ভাল কিছু নয়। যত দামী জিনিস হারাবে বিশেষণ ততই চড়া ও কড়া হবে।

দুটি জিনিস অতি বদ ও ছ্যাঁচড়া টাইপের, সে দুটি হল চশমা ও ছাতা। এর মধ্যে চশমা হল তুলনাহীন বদ। কিছুটা প্রেমিক-প্রেমিকার মতো। ছাতা তবু বাইরের বিশাল পৃথিবীতে হারায় কখনও সখনও ফিরে আসে। চশমা দিনের পর দিন নাকের গোড়ায় বসে থেকেও ডাহা অকৃতজ্ঞ। বাড়িতেই হারিয়ে যাবে বারে বারে। তোলপাড়। শেষে দেখা যাবে মালিকই তার ওপর চেপে বসে চ্যাপ্টা করে দিয়েছেন। একজোড়া মোজা দম্পতি প্রথম কয়েকদিন, ধরা যাক বিবাহ ও ফুলশয্যায় রাত পর্যন্ত একসঙ্গে, তারপই চির-বিচ্ছেদ।

চশমার স্বভাব প্রেমিক-প্রেমিকার মতো কেন! ময়দানের ঘাসে, ইডেনে গঙ্গার ধারে দিনের পর দিন যুগলে বসলেন। কত বাদাম ভাজা, ঝালমুড়ি, ভাঁড়ের চা কত পরিকল্পনা, চিমটি কাটাকাটি। পাকা সম্পর্ক গড়ে ওঠে কি? কদাচিৎ। অবশ্য এটাও ঠিক প্রেমের পর খড়খড়ে বিয়ের চেয়ে বিরহই ভাল। বেশিরভাগ প্রেমের গান বিরহের গান। প্রেম মনে হয় জাতিতে মুসলমান, বিরিয়ানি, রেজালা, চাপের মতো। সাজাহানের হাতে পেটেন্ট। শেষ কথা তাজমহল। সতীর চিতা হয়। প্রেমের সমাধি। প্রেমের সমাধি ফুলে ফুলে ঢেকে দাও। মাথা ঠেকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদ প্রেমের গান বিশ্লেষণ করলে একটি চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যাবে শেষ পর্যন্ত প্রেমিককে হতে হবে দেবদাস। বোতল কোলে বেতালে পা। সবাই রেগে যাবেন তবু বলি রুডইয়ার্ড কিপলিং কী বলেছিলেন, মনে হয় অনেক ধাক্কা খেয়ে—The female of the species is more deadly than the male. বলতে চাইছেন জীবজগতে নারী প্রজাতি অতি সাংঘাতিক। ফ্রয়েড-এর কথা হল The great question that has never been answered and which I have not yet been able to answer, despite my thirty years of research into the femine Soul, is 'What does a woman want'? তিরিশ বছরের গবেষণা তবুও জানা গেল না—মেয়েরা কী চায়? সায়েব তোমার বহু আগে আমাদের ঋষির বলে গেছেন, দেবতারাই যার তল পেলেন না, মানুষ তো কা কথা! আমাদের ভোলা মহেশ্বরের 'স্ট্র্যাটেজি'ই সর্বযুগের উপযোগী। মা কালী খুব লম্ফ ঝম্ফ করছেন সংসার প্রায় ফেড়ে ফেলেন। কুকুর, বেড়াল লাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। প্রতিবেশী একটি শৃগাল দেখতে এসেছে। গোলেমালে যা পাওয়া যায়! কাজের লোক আসেনি রাঁধতে, রাঁধতে গ্যাস ফুরিয়েছে। মহাদেব সংসারের খবর রাখেন না। নিকুচি করেছে তোর শিবের সংসারের। মহাদেব তাঁর বিশাল বুকটি পেতে দিলেন। কাটতে হয় কেটে ফেলো। ভ্যানিটি ব্যাগের মতো কাটা মুণ্ডটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। সৃষ্টির আদি থেকেই গরল খেয়ে গলাটি নীল। অমৃতপায়ী দেবতারা ক্যাবিনেট মিটিং ডেকে

'টাইটেল' দিলেন, 'নীলকণ্ঠ'। পৃথিবীতে যার কোনও দাম নেই। 'নাইট', 'লিজিয়ান অফ অনার' এসব পেলে। ভারতবর্ষ থেকে 'ভারত রত্ন' পেতে পারতেন। তন্ত্র লিখেই বা কী হল! নো নোবেল পুরস্কার। পার্ক স্ট্রিটে একটা নাচা-গানার জায়গার নাম হয়েছে, 'তন্ত্র'। সে মন্দের ভাল।

বালতি দিয়ে শুরু হয়েছিল। এইবার কাঁচি। কালও আলমারির মাথায় ছিল, আজ আর নেই। এক্ রাউন্ড খ্যাচাখেচি। 'সাত সকালে তোমার কাঁচির কী দরকার! পকেট কাটতে বেরবে?' কত্তা খেপে গিয়ে চাঁদনি থেকে চল্লিশটা কাঁচি কিনে আনলেন। বিক্রেতা সহকারীকে ফিসফিস করে বলছেন, 'পকেটমারদের জন্যে নতুন স্কুল খুলেছে, বুঝলি।' এতেও সমস্যার সমাধান হল না। কাঁচির কাঁচি মারার স্বভাব গেল না। কর্তার শিক্ষা হল। কাটার চেয়ে ছেঁড়া ভাল! আর কাটার জন্যে ভগবান তো তোমাকে এক সেট দাঁত আসার সময়েই দিয়ে দিয়েছেন। ইঁদুরকে গুরু করো।

একটা কথা সবাই জানেন, একালের শ্রেষ্ঠ 'ট্রেজার রুম' হল বাথরুম। কত কী পাওয়া যায়। অজস্র মুখখোলা নানা মাপের সেফটিপিন। নানা সাইজের রবার গার্টার। কখনও দামী আংটি, একটি কানের দুল। লকেট লাগানো হার। মাঝে মধ্যে দলা পাকানো এককেতা নোট। বলে টাকার গরম, সেই গরমেই হয়ত চান করতে ঢুকে বেরতে ভুলে গেছে। সাবান ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। একমাত্র তার জন্মদিনে অর্থাৎ মোড়ক যেদিন খোলা হয়, সেই দিন দেয়ালে গাঁথা সাবান দোলনায় কিছুক্ষণের জন্যে থাকে। তারপর মিনিটে মিনিটে যতই তার বয়েস বাড়তে থাকে দামাল শিশুর মতো, পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়। মানুষ বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে আকার আকৃতিতে বড় হয়। সাবান যত বয়েস বাড়ে তত ছোট হয়। শেষটা এক—অদৃশ্য!

সংসারে কে কবে চাওয়া মাত্র রুমাল পেয়েছে। জোড়া মিলিয়ে মোজা। চাইলেই চট করে কি পাওয়া যাবে একটুকরো কাগজ আর ডট পেন। ঠিকানা আর ফোন নম্বর লেখা ডায়েরিটা! কত বাক্স, কত আলমারি আছে। যা খোলাই যাবে না, কারণ চাবি হারিয়ে গেছে।

এমন দিনও আসবে, মানুষ খাবার চিবিয়ে ঢোঁক গিলতে ভুলে যাবে। গাল ফুলিয়ে বসেই আছে। এমন দিন আসবে দম ছেড়ে দম নিতে ভুলে গেছে বলে মরেই গেল। হায় ভগবান!

বাউল

অতি মূল্যবান একটি জিনিস চিরতরে হারিয়ে গেল জীবন থেকে। সেটি হল, আমার শৈশব। আর ফিরবে না। সময় থেকে সময় চলে গেল। ফেলে গেল স্মৃতি। জীবনের সঙ্কীর্ণ দিকগুলি তখন বুঝতে পারতুম না, অর্থ, বিত্ত, সম্পত্তি, স্বার্থ ইত্যাদি।

যে মাঠে আমরা খেলা করতুম, সেটা কার সম্পত্তি আমাদের জানার দরকার ছিল না। যে-পুকুরে সাঁতার কাটতুম ঢিল, ঢিল, ঢিলের পর ঢিল ছুড়ে জলটাকে অশান্ত করে তুলতুম, সেটা কোন জমিদারের খবর রাখার প্রয়োজন হয়নি। গরিব, বড়লোকের ব্যবধান বুঝতুম না। বড়লোকরা অবশ্য আমাদের জীবনসীমায় কখনই আসত না। অহংকারের কারাগারে মোসায়েব পরিবৃত হয়ে মেয়াদ খাটত যেন। ঐশ্বর্যের কারাদণ্ড। সংখ্যায় তারা বেশি ছিল না। অদ্ভুত ধরনের মানুষ সব। তাদের নজরে আমরা ছিলুম ছোটলোক। আমরা তাদের জানোয়ার ভাবতুম, তারাও আমাদের জানোয়ার ভাবত। আমাদের সঙ্গে আধময়লা হাফপ্যান্ট, কোনও রকমের একটা জামা। ধুলো কাদা মাখা পা। এলোমেলো চুল। গাছ থেকে ডাঁসা ডাঁসা পেয়ারা পেড়ে খাই। ছুটে গিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সাঁতরে এপার ওপার করি। পয়সা পেলে তেলেভাজা ফুলুরি কিনে ভাগ করে খাই। ধর্মস্থানে দরিদ্রনারায়ণসেবা হলে পঙ্‌ক্তিভোজনে পাতা পেতে খিচুড়ি খেতে বসে যাই। হঠাৎ আসা বাউল যখন একতারা বাজিয়ে মন উদাস করা গান গাইতে মাঠের পথ দিয়ে হেঁটে যেত আমরা তার পিছু নিতুম। তার গানের তালে তালে নাচতুম। তাকে অনুসরণ করে গ্রামের

একেবারে শেষ সীমায়, যেখানে আর কোনও লোকালয় নেই। বিশাল প্রান্তর, ধূসর নীল আকাশের গায়ে গিয়ে মিশেছে। একটি বটের একটু ছায়া। তার তলায় সেই অচেনা বাউল ঝোলাটি নামিয়ে বসল। তবে হাতের অবাক যন্ত্রটিকে তালি তাপ্পি মারা ঝোলায় ঠেস দিয়ে রেখে একটি বিড়ি ধরাল। লম্বা এক টান মেরে ফিকে ধোঁয়া ভাসিয়ে দিল বাতাসে। চৈত্রের চাষের জমির মতো ফাটাফাটা মুখ। অসম্ভব রকমের লাল দুটো চোখ। চুল আর দাড়ি মিলেমিশে গেছে।

তিন চার টান মারার পর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—'কী রে গোপালের দল, কী দেখছিস?'

আমরা উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করেছিলুম—'তোমার মতো হতে হলে কী করতে হবে!'

বাউল বলেছিল—'কিচ্ছু না, পথে নামতে হবে। ইস্কুলে পড়িস তো?'

আমরা খুব দুঃখের গলায় বলেছিলুম—'হ্যাঁ, তা তো পড়তেই হয়।'

বাউল বললে—'হয়ে গেল, আর কোনও দিন আমার মতো হতে পারবি না। ওরা তোদের হিসেব শিখিয়ে দেবে। দুই আর দুয়ে চার। মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেবে। ঠেলে ফেলে দেবে পাতকোর মধ্যে। জীবনটাকে ছোট করে দেবে। একটা চাকরি দেবে, একটা হিসেবের খাতা দেবে, একটা বউ দেবে, গোটাকতক ছেলেমেয়ে। অভাবী মানুষ বাউল হতে পারে না। দশ, বিশ, কুড়ি বিঘে জমি নয়, গোটা পৃথিবীটা আমার জমিদারি। আমার ঘরের ছাতটা কত বড় জানিস? ওই যে মাথার ওপর আকাশ পুরোটাই আমার ছাত। আমি সম্রাট। তোদের হবে না। জন্মদোষে তোরা ছোট হয়ে জন্মেছিস। আমার কিছু নেই তাই আমি অনেক বড়।

গাছতলায় কিছুক্ষণ বসে থেকে বাউল মাঠ পেরিয়ে আকাশের দিকে চলে গেল। আমাদের শৈশবও বাউলের মতোই। তফাত এই, বাউল যায় মুক্তির দিকে। আমাদের শৈশব ভুল পথে চলে যায় বন্ধনের দিকে।

'জানিস! আমি কে?'

বাঙালি হয়ে বাঙালির সমালোচনা করা খুব সহজ। বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামীজী, সকলেই করেছেন। লেখক ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের লক্ষ্যই ছিল বাঙালির জীবন ও সমাজ। আমার মনে হয় সব জাতির মানুষই এইরকম করে থাকেন।

সমাজ হল দর্পণ। সেই দর্পণে মানুষের যাবতীয় অসঙ্গতি ফুটে ওঠে। এইসব অসঙ্গতি কী। প্রথম হল অহংকার। কতরকমের অহংকার।

টাকার অহংকার

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কাহিনী 'ব্যাঙের আধুলি'। ঠাকুর অবতার। মুহুর্মুহু তিনি সমাধিতে চলে যেতেন। যেই মনে হল ভগবানের কাছ থেকে ঘুরে আসি অমনি সসীম থেকে অসীমে চলে যেতেন। কিন্তু ঠাকুর ছিলেন মানবজীবন ও সমাজের সূক্ষ্ম দর্শক।

মানুষের চরিত্রের মধ্যে নিমেষে ঢুকে যেতেন। অতলে প্রবেশ। যেন কাচের মানুষ। ভেতরে সংস্কার। ভাল, মন্দ যা আছে সব দেখতে পেতেন। মানুষটাকে পড়ে ফেলতেন নিমেষে।

ঠাকুর বলেছেন, 'এক একটি উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। যে কালাপেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে, আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি (Stick) এইসব এসে জোটে। রোগা লোকও যদি বুট জুতো পরে সে অমনি শিস দিতে আরম্ভ করে। সিঁড়ি ওঠবার

সময় সাহেবদের মতো লাফিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ-টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাসফ্যাস করে টান দিতে থাকবে।

'টাকাও একটি বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আর একরকম হয়ে যায়, সে মানুষ থাকে না। এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা-যাওয়া করত। সে বাইরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে আমরা কোন্নগর গেছলুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকো থেকে যেই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে। বোধ হয় হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বলছে, 'কি ঠাকুর! বলি আছ কেমন?' তার কথার স্বর শুনে, আমি হৃদেকে বললুম, 'ওরে হৃদে! এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এইরকম কথা।'

ঠাকুর এইবার সেই বিখ্যাত ব্যাঙের গল্প বলছেন। 'একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। গর্তে তার টাকাটা ছিল। একটা হাতি সেই গর্ত ডিঙিয়ে গিছিল। তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতিকে লাথি দেখাতে লাগল। আর বললে, 'তোর এত বড় সাধ্য যে, আমায় ডিঙিয়ে যাস!' টাকার এত অহংকার!'

মতুয়ার বুদ্ধি

আমি যা বলছি, আমি যা বুঝেছি সেইটাই ঠিক। তুমি কিছু জানো না। আমার ঘড়িই ঠিক। তোমার ঘড়ি ভুল। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলছেন, 'কতকগুলো কানা একটা হাতির কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিল, এ জানোয়ারটার নাম হাতি। তখন কানাদের জিজ্ঞাসা করা হল, হাতিটা কী রকম? তারা হাতির গা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বলল, 'হাতি একটা থামের মতো।' সে কানাটি কেবল হাতির পা স্পর্শ করেছিল। আর একজন বললে 'হাতিটা একটা কুলোর মতো।' সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল। এইরকম যারা শুঁড়ে কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল, তারা নানাপ্রকার বলতে লাগল।'

পৃথিবীর সব জাতির মধ্যেই এই ধরনের একবগ্গা মানুষ মিলবে। পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘুরছে, না সূর্যের চারপাশে পৃথিবী, একটা যুগ এই হাঙ্গামায় কেটে গেল। প্রাণদণ্ড কারাবরণ। ধর্মের জগৎ আর বিজ্ঞানের জগতেই মতুয়াদের সংখ্যা বেশি।

শাক্ত আর বৈষ্ণবের কলহ ইতিহাস হয়ে আছে। রামপ্রসাদ ছিলেন শাক্ত। আর আজু গোঁসাই বৈষ্ণব। দুজনের মধ্যে মাঝেমাঝেই লেগে যেত। রামপ্রসাদ বললেন, 'আজু! কর্মের ঘাট, তৈলের কাঠ, আর পাগলের ছাট মোলেও যায় না।'

গোস্বামী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'কর্মডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর মোলেও যায় না।'

রামপ্রসাদ গান লিখলেন—

ডুব দে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।।

আজু গোঁসাই লিখলেন,

ডুবিসনে মন ঘড়িঘড়ি।

দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি।
একে তোমার কফো নাড়ী ডুব দিও না বাড়াবাড়ি।
তোমার হলে পরে জ্বরজারি মন যেতে হবে যমের বাড়ি।

এই আকচাআকচির মধ্যে মজা ছিল। বিদ্বেষ নয়। কিন্তু রাজা রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে জুটেছিল প্রকৃত ধিক্কার। এই প্রসঙ্গে একটিই সান্ত্বনা, আক্রান্ত হলেই বুঝবে, তুমি বড় হচ্ছ। বড় গাছেই ঝড় লাগে। ঈর্ষা মানুষের সহজাত।

একজন আর একজনকে বলছেন, 'শুনেছ! অমুকের ছেলে হাকিম হয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার উত্তর, 'হলে কী হবে, দেখবে মাইনে পাবে না।'

লোক না পোক

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করছেন, 'নরেন্দ্র! তুই কী বলিস? সংসারি লোকেরা কত কী বলে! কিন্তু দেখ, হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কতরকম চিৎকার করে। কিন্তু হাতি ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।'

ঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন, 'না রে, অত দূর নয়। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাত থাকতে হয়'। কেশবচন্দ্রকে বলছেন, 'আমার নাম কাগজে প্রকাশ করো কেন? বই লিখে, খবরের কাগজে লিখে, কারুকে বড় করা যায় না। ভগবান যাকে বড় করেন, বনে থাকলেও তাকে সকলে জানতে পারে। গভীর বনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান করে যায়। অন্য মাছি সন্ধান পায় না। মানুষ কী করবে? মানুষের মুখ চেয়ো না।

লোক! পোক!

যে মুখে ভাল বলছে, সেই মুখে আবার মন্দ বলবে।

উপকারীর নিন্দা

প্রয়োজনে পায়ে হাত। প্রয়োজন ফুরোলেই গলায় হাত। প্রবাদে আছে, 'কাজের সময় কাজি। কাজ ফুরোলেই পাজি।' বিদ্যাসাগর মশাইকে একজন এসে বললেন, 'অমুক আপনার খুব নিন্দা করছিল।' বিদ্যাসাগরমশাই কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'তার কোনও উপকার করেছি বলে তো মনে পড়ছে না ভাই?'

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, 'পরোপকারী বাঘের পেটে যায়।'

রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ, 'রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করোনি।'

সাবধানে

কাদের কাছ থেকে? ঠাকুর বলছেন, এদের কাছ থেকে—

মুখহলসা ভেতরবুঁদে, কান ভুলসে,
দীঘল-ঘোমটা নারী।
আর পানাপুকুরের শীতল জল
বড় মন্দকারী।

টক শো

'হ্যালো, হ্যালোও।'

'হ্যাঁ, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন।'

'পাচ্ছি। আমার গলা শুনতে পাচ্ছেন।'

'খুব আস্তে আসছে; হ্যালোও, আর একটু জোরে বলুন। কে বলছেন?'

'সোনালি সাহা, বারুইপুর থেকে বলছি। বাব্বা, কতদিন ধরে চেষ্টা করছি। ভগবানকে পাওয়া যায়, আপনাদের পাওয়া যায় না। আজ আমার জন্মদিন। আজই আপনাকে পেলুম। কি ভাগ্য! সোনাদা, আজ আপনারা কী নিয়ে করছেন? আমি এই মাত্র খুললুম তো। সঙ্গে কে আছেন?'

'রূপা।'

'ও রুপোদি। নমস্কার। আপনাদের প্রোগাম আমার ঘুম, চান, পড়া, খাওয়া সব কেড়ে নিয়েছে। দু কেজি ওজন কমে গেছে। দু চোখের কোণে কালি। সোনাদা, রুপোদি আমি না এবার ফেল করেছি।'

'সে কী? কোন ক্লাসে পড়ো তুমি?'

'ক্লাস নাইনে। সর্বমঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়। সব সাবজেকটে ফেল। মা গায়ে কেরোসিন ঢেলেছিল। ভাগ্য ভাল, দেশলাইয়ের খোলে একটা মাত্র কাঠি ছিল, জ্বলেনি। বাবা বললে, ভালই হয়েছে ড্রাইওয়াশ হয়ে গেল। একমাস হয়ে গেল এখনো মায়ের গা দিয়ে ভরভর করে কেরাসিনের গন্ধ বেরোচ্ছে। বাবা নাম রেখেছে কেরাসিনের কুপি।'

'তুমি তো ভারি দুষ্ট মেয়ে সোনালি।'

'সবাই তাই বলে, আপনিও বলছেন. যান কথা বলব না। আচ্ছা সোনাদা

আপনারা মানে ব্যাটাছেলেরা যখন কথা বলেন, তখন গলাটা অত ভার ভার করেন কেন? ওখানে বুঝি বরফ পড়ে।'

'এখানে ঠাণ্ডা অবশ্য আছে তবে এয়ারে কথা বলতে হলে একটু এয়ার নিয়েই বলতে হয়।'

'কে হাসছে?'

'রূপা। ওর হাসি রোগ আছে।'

'রুপোদি, তুমি কিছু বলছ না কেন? আজ কী নিয়ে করছ তোমরা?'

'হজম।'

'কী হজম!'

'সব রকম হজম,খাদ্য হজম, কথা হজম, অপমান হজম, পয়সা হজম, হজমি হজম।'

'তাই না কি! আমার দিদার একদম হজম হয় না, দিদাকে কিছু বলো না। এই যে হাত বাড়াচ্ছে।'

'হ্যালোও, ও মেয়ে, আমার যে কিছু হজম হয় না মেয়ে। তিন দিন আগে কাঁঠাল খেয়েছি আজও ঢেঁকুর মারছে। কী ওষুধ খাই বলো তো! এত আম, এত পেয়ারা। চোখের সামনে সবাই খাচ্ছে, আমি শুধু বসে বসে দেখছি।'

'ও মাসিমা, এ হজম......।'

'এই দেখ, মাসিমা কী রে, আমি দিদিমা, সামনের ভাদ্রে একাশি হবে।'

'দিদিমা, এই বয়েসে হজম স্বাভাবিকভাবেই কমবে। কাঁঠাল আর খাবেন না, পেঁপে খান।'

'কী কথা! কাঁঠাল আমার প্রিয়। কাঁঠাল আমি খাবই। আমার বাগানের কাঁঠাল পাঁচ ভূতে সাবড়াবে আর আমি বসে বসে দেখব!'

'আমরা আপনার সঙ্গে আবার পরে কথা বলব দিদিমা, একটা গান বাজিয়ে নি।'

'গান বাজনা পরে হবে, আগে হজমের কথা হোক। তোমরা কি জানো আমি হজমদার ফেমিলির মেয়ে। আমার ঠাকুরদা একশো কুড়ি বিঘে জমি খেয়েছিলেন, আর আমার বাবা কলকাতার দুটো তিনতলা বাড়ি খেয়েছিলেন।'

'জমি, বাড়ি খাওয়া যায়?'

'বুঝলি না বোকার মরণ, বেচে মাছ মাংস ঘি লুচি রাবড়ি খেয়েছিলেন। শোনো আমি খাইয়ে বংশের মেয়ে; কিন্তু বাবা কাঁঠাল হজম হচ্ছে না।'

'দিদিমা, আমাদের রূপা বলছে, আপনি কাঁঠাল বিট নুন দিয়ে খান। ছাড়ছি এখন।'

'রূপা এইবার কী হবে। একটা গান হোক, 'আজ তবে এইটুকু থাক, বাকি খাওয়া হবে পরে।'

'এ গান কোথা থেকে পেলে সোনাদা, আজ তবে এইটুকু থাক, বাকি কথা পরে হবে।'

'সে আমি জানি, ভাবছিলুম এইরকম একটা গান থাকলে ভাল হত—আজ তবে এইটুকু খাক, বাকি খাওয়া হবে পরে। ধূসর পেটের পথ, ভেঙে পড়ে আছে দাঁত, বহু দূর দূর যেতে হবে। রূপা একটা ফোন আছে মনে হচ্ছে। নেবে না কি?'

'নাও।'

'হ্যাঁলো।'

'হ্যাঁ, সোনাদা, রুপোদি, আমি দমদম থেকে নাদু ঘোষ বলছি, আপনাদের অনুষ্ঠান খুব ভাল হচ্ছে।'

'হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, আমরা সবাই কানখাড়া করে বসে আছি। আমাদের কোর্ট-কাছারি সব বন্ধ হয়ে গেছে। আমার বোন তো স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। যা অবস্থা, হাঁড়ি চড়বে না। সোনাদা একটা প্রশ্ন করি—মহাভারতে আছে না, ভীম লোহাব ছোলা খেয়েছিল, সে ছোলা কি হজম হয়েছিল!'

'নাদুবাবু একটা সামান্য কথা জেনে রাখুন, গিলে খেলে হজম হয় না, চিবিয়ে খেলে হজম হবে, এখন দেখতে হবে ভীম চিবিয়েছিল, না গিলেছিল!

'সোনাদা, আর একটা প্রশ্ন, উই পোকা যে বই খায়, সেই বই কি হজম করতে পারে?'

'নিশ্চয়ই পারে, অক্ষরসুদ্ধ হজম করে ফেলে। উই ঢিবি থেকেই তো অত বড় কবি বাল্মীকির জন্ম হল। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের তুলনা নেই। রুপোদি কিছু বলুন। এত চুপচাপ কেন?'

'আমার মন খারাপ।'

'কেন রুপোদি?

'আজ একটা বিয়ের নেমন্তন্ন ছিল যাওয়া হল না।'

'আমাদের বাড়িতে চলে আসুন। আজ আমার মায়ের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি। মাকে একটা গান উপহার দিতে চাই। বাজাবেন। মধুর আমার মায়ের হাসি।'

'ওটা তো ভাই মৃত্যুর গান। আমরা একটা অন্য গান বাজাচ্ছি।'

'কোনটা?'

'রুণা লায়লা, সাধের লাউ বানাইল, হজমের টপিকস তো, লাউ আছে, চিংড়িটা দিয়ে দিলেই ফাসক্লাস লাউচিংড়ি।'

'হ্যালোও।'

'হ্যাঁ হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন।'

'পাব না মানে, আমার বাপ পাবে, অমন মেঘের মতো গলা। কোথা থেকে পেলে মানিক, ডোবায় থাকো বুঝি।'

'কে বলছেন?'

'দাঁড়াও বাবা, নাম ভুলে গেছি। দু বোতল মেরে দিয়েছি, এরপরেও যদি নাম মনে থাকে, তাহলে আমি কেস করব। ভেজালের কেস। সুপ্রিম কোর্টে যাব, প্রিভি

কাউন্সিলে। শোনো শোনো মক্‌কেল, আমি গিরিশ। গিরিশ ঘোষ। নাম শুনেছ। আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল মাইরি। মা কালীর দিব্যি। আমি এখন যেখানে থেবড়ে বসে আছি, সেই গিরিশ পার্কে একবার সুট করে চলে এসো। কথা দিচ্ছি, স্কচ খাওয়াব। আমার মাটি থ্যাবড়ান অবস্থাটা একবার দেখে যাও। চোখ ফেটে জল আসবে। পাতালের দৈত্যরা আমার বাগানের বসন্ত কেড়ে নিয়েছে। মাইকেল, বিদ্যাসাগরের চেয়ে কাহিল অবস্থা। উঠে চলে যাব, সে উপায় নেই। বেদিতে ফিক্‌স করে দিয়েছে। তোমার নামটা যেন কী!'

'সোনা।'

'সঙ্গের মেয়েটি।'

'রুপো।'

'আহা! সোনার কাটি, রুপোর কাটি।

রাজকন্যের ঘুম ভাঙাও। আচ্ছা ব্রাদার বলতে পারো, কে আমার স্টারে আগুন দিয়েছে? আচ্ছা যাক, ওটা তোমার লাইন নয়, আমি দেবেন্দ্রবিজয়কে জিজ্ঞেস করব। সোনা মাস্টার, ওই যে ইন্দুবালা ফোন করেছিল। কাঁঠাল, কাঁঠাল। কাঁঠালকে বলে দাও, একটা গোটা কাঁঠাল না খেলে হজম হবে না। ওর মধ্যে একটা হজমি কোয়া থাকে। বাই!'

'রূপা, আজ অবস্থা কাহিল। কোনো গানই তো শোনানো যাচ্ছে না।'

'তুমি লাউটা ঝুলিয়ে দাও না।'

'ওই নাও, আবার ফোন। রূপা এবার তুমি ধরো।'

'হ্যালোউ।'

'অ্যায় রূপা ফ্রিজের চাবি কোথায় রেখেছিস?'

'মরেছে। আমার ব্যাগে।'

'আমার ব্যাগে! আমরা সব উপোস করে থাকি।'

'রূপা গানটা চাপাই, সাধের লাউ! আবার ফোন। হ্যালো।'

'এই যে, বকবকটা বন্ধ করো না মানিক। মানুষকে একটু ঘুমুতে দাও।'

'আপনার হাতেই তো যন্ত্র, অফ করে দিন না।'

'তাহলে কি আর পয়সা খরচ করে ফোন করি! যন্তর আমার বউয়ের হাতে। মশারির মধ্যে যন্তর সমেত সেঁধিয়ে গেছে।'

'অনুরোধ করুন না।'

'অনুরোধ! ভুঃ। মাল চেনো না। জীবনে যে একটা কথাও শুনল না, সে এই অনুরোধ শুনবে! আচ্ছা ছোকরা, তোমাদের আজকের টপিকস তো হজম!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, বউ হজমের কোনো দাওয়াই জানা আছে?'